নিউজ লেটার

৪৬ তম বর্ষ:
১ম-২য় সংখ্যা

এপ্রিল-জুন ২০২৫ ইং। শাওয়াল-জিলহজ ১৪৪৬ হিজরি

Newsletter
Vol 46 | Issue : 1-2 | April-June, 2025

১২ দিনের ইরান-ইসরাইল যুদ্ধে বিজয়ের পর ইরানের জনগণের বিজয় মিছিল

১২ দিনের যুদ্ধে ইরানি শিশু শহীদদের স্মরণে

১২ দিনের যুদ্ধে ইরানি শিশু শহীদদের স্মরণে

নিউজ লেটার

কালচারাল সেন্টার
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস ঢাকা -এর বুলেটিন

৪৬তম বর্ষ : ১ম-২য় সংখ্যা

এপ্রিল-জুন ২০২৫ ইং
শাওয়াল-জিলহজ ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি

সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য

নূর হোসেন মজিদী
মো. আশিফুর রহমান
তাইয়্যেবা তাবাসসুম
তানজিনা বিনতে নূর

نیوزلت ر

فصلنامه رایزنی فرهنگی سفارت ج. ا. ایران در داک ا
سال ۴۶ ، شماره ۱ و ۲ ، آوریل-ژوئن ۲۰۲۵
فروردین – خرداد ۱۴۰۴

مدیر مسئول و سردبیر

سیدرضا میرمحمدی
رایزن فرهنگی
سفارت جمهوری اسلامی ایران در داکا، بنگلادش

اعضای هیئت تحریریه

نور حسین مجیدی
محمد آصف الرحمان
طیبه تبسّم
تنجینه بنت نور

ডিজাইন : নোমান শিশির
মুদ্রণ : চৌকস প্রিন্টার্স

সূচিপত্র

০১. সম্পাদকীয় ... ০২

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ

০২. ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আল উযমা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর হজবাণী ... ০৩
০৩. ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আল উযমা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভিডিও বার্তা ... ০৫
০৪. ইসরাইলি হামলার বিষয়ে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার দ্বিতীয় টিভি বার্তা ... ০৬
০৫. ইরানের সর্বোচ্চ নেতার তৃতীয় টিভি বার্তা ... ০৭
০৬. ইরান সম্পর্কিত খবর ... ০৮

আদর্শ

০৭. হজের তাৎপর্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ... ১১
০৮. সমগ্র বিশ্বের নারী জাতির আদর্শ হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)- ড. নুসরাত ফাতেমা ... ১৪
০৯. মুহররম, আশুরা ও ইমাম হুসাইন (আ.)-এর স্মরণে কয়েকটি হাদিস ... ২১
১০. মুবাহিলার আধ্যাত্মিক দর্শন : আহলে বাইত (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন ও ইসলামের চিরন্তন বিজয়- মীর আশরাফ-উল-আলম ... ২৫
১১. ইমাম খোমেইনী (রহ.): বহুমুখী গুণের অধিকারী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব- জাফর বাঙ্গাশ ... ৩০

নির্বাচিত প্রবন্ধ

১২. ইরানের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড- আহমদ আতিক ... ৩৩
১৩. গাজা ফিলিস্তিন বিষয়ক দুটি প্রতিবেদন ... ৩৬

সাহিত্য-সংস্কৃতি

১৪. নিজামি গাঞ্জুবির কাব্যে রোমান্টিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধ- ড. মো. আতাউল্যাহ ... ৪০
১৫. নজরুল-সাহিত্যে ফারসির প্রভাব- ড. হোসনে আরা ... ৪৭
১৬. জ্ঞানসাধক কবি ও সাংবাদিক অধ্যাপক সিরাজুল হক- সুজন পারভেজ ... ৫৪

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

১৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরানি নারীদের সাফল্য- সাইদুল ইসলাম ... ৫৬

পর্যটন

১৮. তেহরানের খুঁটিনাটি- মোঃ কামাল হোসাইন ... ৬০

সভা-সমাবেশ

১৯. ঢাকায় ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত ... ৬৪
২০. ঢাকায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রায়িসির শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত ... ৬৭
২১. ঢাকায় 'নজরুল সাহিত্যে ফারসির প্রভাব' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত ... ৭০

কালচারাল সেন্টার

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা, বাংলাদেশ

বাড়ি নং-৭, রোড নং-১১ (পুরানো ৩২), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯। ফোন : +৮৮০-২-৪১০২০৪২১-২৪
E-mail : dhaka.icro@gmail.com

সম্পাদকীয়

১২ দিনের আরোপিত যুদ্ধের বাস্তবতা

যে দিনগুলোতে নিউজলেটারের এই সংখ্যার বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল, সেই দিনগুলোতে পশ্চিম এশীয় অঞ্চলে একটি বড় ঘটনা সংঘটিত হয় এবং যায়নবাদী সরকার পশ্চিমা শক্তি ও ন্যাটোর সহযোগিতা ও সমর্থনে ১৩ জুন, ২০২৫, শুক্রবার সকালে ইরানের উপর সামরিক আক্রমণ শুরু করে। এই প্রকাশ্য ও অবৈধ সামরিক আগ্রাসন ছিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যার বিভিন্ন দিক ও ফলাফল রয়েছে এবং এটি অবশ্যই সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা উচিত। এই ১২ দিনের আরোপিত যুদ্ধের বিভিন্ন দিক ও ফলাফল সম্পর্কে এই সম্পাদকীয়তে সংক্ষেপে যা বলা যেতে পারে তা হলো:

১. ইরানের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী সরকার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আগ্রাসন ছিল আন্তর্জাতিক নীতি ও আইনের পরিপন্থী এবং জাতিসংঘের সনদেরও পরিপন্থী। আর তাই এই সামরিক আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে অনুচিত এবং অবৈধ হিসেবে পরিগণিত। এই পরিস্থিতিতে, জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদকে অবশ্যই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে সমাধান করা দরকার এবং এই সামরিক আক্রমণের নিন্দা করা এবং আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া তাদের আইনি দায়িত্ব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এই ক্ষেত্রে এটিও প্রমাণিত হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সম্প্রদায়গুলো এই ক্ষেত্রে তাদের আইনি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করছে না এবং পশ্চিমা শক্তির প্রভাবে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এবং ঘটনাবলির প্রতি তাদের দ্বৈত ও নির্বাচনী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এই দ্বৈত ও নির্বাচনী পদ্ধতি বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সম্প্রদায়গুলোর, বিশেষ করে জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদের অদক্ষতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ এবং সংকটের সঠিক ব্যবস্থাপনাকে কঠিন এবং অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

২. এই স্বল্পমেয়াদি কিন্তু বৃহৎ ও বহুমুখী যুদ্ধে কেবল ইহুদিবাদী সরকারই ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি; বরং পশ্চিমা শক্তি এবং ন্যাটোও এই সরকারের সঙ্গী ও সমর্থক ছিল এবং তারাই এই আগ্রাসী ও ফিলিস্তিনি ভূমি দখলকারী ইহুদিবাদী সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সরাসরি যুদ্ধে অনুপ্রবেশ করে এবং ইসফাহান ও কোম শহরে অবস্থিত ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলোতে বোমা হামলা চালায়।

৩. যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিকোণে এই ব্যাপক ও সর্বাত্মক যুদ্ধ ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক প্রযুক্তি ও স্থাপনা ধ্বংস করার অজুহাতে সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু মূলত এটি ছিল ইসলামি প্রজাতন্ত্রকে উৎখাত এবং ইরানকে ভেঙে ফেলার জন্য শত্রুদের একটি বিশাল ও বিস্তৃত পরিকল্পনা। এই ভয়াবহ এবং মহাষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে শত্রুরা ইরানকে নতজানু ও পরাজয়ের মুখোমুখি করতে চেয়েছিল এবং পশ্চিম এশীয় অঞ্চলে ইসলামি প্রতিরোধ ফ্রন্টকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল- যারা ইরানের সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে ইহুদিবাদী দখলদার সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

৪. এই যুদ্ধকে ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের পর থেকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে পশ্চিমা অশুভ শক্তিগুলোর চক্রান্ত ও পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখা উচিত। ইরানের ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের শুরু থেকেই ইহুদিবাদী সরকার ও পশ্চিমা শক্তিগুলো এই বিপ্লবের বিরোধিতা শুরু করে। বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন সময়ে তারা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা, জাতিগত গোষ্ঠীগুলোকে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও দেশকে বিভক্ত করার জন্য উসকে দেওয়া, সাদ্দাম হোসেনের মাধ্যমে ৮ বছরের যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করে এটিকে পরাজিত করার চেষ্টা করে আসছিল। এই ১২ দিনের যুদ্ধও একই লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল এবং এটাকে পূর্ববর্তী ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা থেকে আলাদা কোনও প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

৫. আমেরিকার যায়নবাদী সরকার ও পশ্চিমা শক্তিগুলো ইরানের ইসলামি বিপ্লবকে মোকাবেলা করার জন্য তাদের পূর্ববর্তী প্রচেষ্টা ও কর্মকাণ্ডের মতোই এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে এবং তারা ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার তাদের অশুভ লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। চারটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, যথা: আল্লাহর সাহায্য ও আনুকূল্য, শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, জনগণের সমর্থন ও সাহচর্য এবং ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের শক্তি ইরানকে এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে এবং শত্রুকে পরাজিত করতে সক্ষম করেছিল। এই যুদ্ধে ইরানি সামরিক বাহিনী তেল আবিব, হাইফা এবং আরও কয়েকটি ইসরাইলি শহর, সেই সাথে কাতারের আল-উদেইদে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়। এসব ইহুদি দখলদার সরকার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর এতটাই তীব্র আঘাত হানে যে, তারা নিজেরাই দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের কারণে যুদ্ধ অবসানের আহ্বান জানায় এবং কার্যত তারা পরাজয় মেনে নেয়।

৬. যদিও ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ১২ দিনের যুদ্ধে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল এবং বেশ কয়েকজন সামরিক কমান্ডার এবং পারমাণবিক বিজ্ঞানী শহীদ হয়েছিলেন এবং ইরানের পারমাণবিক স্থাপনার ক্ষতি সাধিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের প্রত্যাশার বিপরীতে এটি ইরানি জাতি ও সরকারকে আরও শক্তিশালী ও সুসংহত করে তোলে, ইরানি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করে এবং তাদের নেতা ও সরকারের প্রতি সমর্থক করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে, ব্যাপক মূল্যায়নের ভিত্তিতে বলা যায়, এই যুদ্ধের ফলাফল সম্পূর্ণরূপে ইরানের পক্ষে ছিল এবং শত্রুরা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি।

৭. আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এই যুদ্ধ ইরান ও ইসলামি বিশ্বের জন্য বিরাট ফলাফল এবং সাফল্য বয়ে এনেছিল এবং এর ফলে, ইরান ও ফিলিস্তিনের প্রতি মুসলিম জাতি এবং ইসলামি দেশগুলো তাদের ঐক্য ও সহানুভূতি বৃদ্ধি করতে বাধ্য করেছিল। অন্য কথায় বলা যায়, এই যুদ্ধে ইরান ইসলামি বিশ্ব এবং সমস্ত মুসলিম জাতির পক্ষে ইসরাইল ও আমেরিকার ইহুদিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং এই কারণেই পরবর্তীকালে তাদের সাহায্য ও সমর্থন লাভ করে। অতএব, বলা যেতে পারে যে, এই যুদ্ধ ছিল ইসলাম ও কুফরের মধ্যে যুদ্ধ এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে যুদ্ধ, যা শেষ পর্যন্ত ইসলামি ফ্রন্ট এবং এই পর্যায়ে সত্য ফ্রন্টের বিজয়ের মাধ্যমে শেষ হয়। তবে, এটি লক্ষ্য করা উচিত যে, ইসলাম ও কুফরের দুটি ফ্রন্ট, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে এই সংঘর্ষ এবং সংঘাত বিভিন্ন রূপে অব্যাহত রয়েছে এবং সংগ্রাম ও জিহাদ এখনও শেষ হয়নি।

৮. এই যুদ্ধে ইরান আবারও ফিলিস্তিন ও এই ভূখণ্ডের নির্যাতিত জনগণের পক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং প্রমাণ করেছে যে, এটি ইহুদিবাদী শত্রুর দখল থেকে ফিলিস্তিনের জনগণ ও ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে মুক্ত করার লক্ষ্যে অবিচল থাকবে এবং প্রতিরোধ অব্যাহত রাখবে। এটি সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আজ ফিলিস্তিন এবং পবিত্র কুদস ইসলামি বিশ্বের প্রথম এবং প্রধান ইস্যু ও সমস্যা এবং অবশ্যই সমস্ত মুসলিম দেশ ও জাতিকে এর মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে।

সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী
কালচারাল কাউন্সেলর
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আল উযমা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভিডিও বার্তা

ইরানের বিভিন্ন স্থানে ইহুদিবাদী ইসরাইলের হামলায় দেশটির বেশ কিছুসংখ্যক কমান্ডার, বিজ্ঞানী এবং বেসামরিক নাগরিক শহিদ হওয়ার পর ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী গত ১৭ জুন ২০২৫ ইরানি জাতির উদ্দেশে ভিডিও বার্তা দিয়েছেন। এই বার্তা টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়েছে। বার্তাটি এখানে তুলে ধরা হলো :

আমাদের দেশের প্রিয় ও মহান জাতির প্রতি রইল আমার সালাম। আমাদের কয়েকজন প্রিয় কমান্ডার ও বিজ্ঞানী এবং বেসামরিক নাগরিকের শাহাদাত, যা সবার জন্য কষ্টদায়ক, তাতে ইরানি জাতি ও তাঁদের পরিবারের প্রতি অভিনন্দন, সমবেদনা ও শোক জানাচ্ছি। আশা করছি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁদের উচ্চ মর্যাদা দান করবেন এবং তাঁদের পবিত্র আত্মা তাঁর বিশেষ করুণায় আচ্ছাদিত করবেন।

আর আমি আমাদের প্রিয় জাতিকে বলতে চাই, ইহুদিবাদী ইসরাইল বড় ভুল করে ফেলেছে, বড় ত্রুটি করেছে, মারাত্মক ভুল করেছে এবং এর পরিণতিতে (দখলদার ইসরাইল) অসহায় হয়ে পড়বে ইনশাআল্লাহ। ইরানি জাতি শহিদদের মূল্যবান রক্ত বৃথা যেতে দেবে না, তারা তাদের দেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন মেনে নেবে না। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত এবং দেশের কর্মকর্তাগণ ও সর্বস্তরের জনগণ সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে রয়েছে।

আজ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন মহল ও ব্যক্তি থেকে একই রকম বার্তা জারি করা হয়েছে। সকলেই মনে করেন যে, আমাদের অবশ্যই ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট সন্ত্রাসী ইহুদীবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা শক্তিমত্তার সাথে কাজ করব এবং তাদেরকে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।

নিঃসন্দেহে ইহুদিবাদীদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। ইহুদিবাদীরা যেন এটা না ভাবে যে, তারা আঘাত করেছে এবং এখানেই তা শেষ হয়ে গেছে। না, তারা শুরু করেছে এবং তারা যুদ্ধের সূচনা করেছে। ইহুদিবাদীরা যে মারাত্মক অপরাধ করেছে, তা থেকে তাদেরকে অক্ষত অবস্থায় বের হওয়ার সুযোগ দেব না। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনী অবশ্যই এই ঘৃণিত ইহুদিবাদী শত্রুর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানবে। ইরানি জাতি আমাদের সাথে আছে, সশস্ত্র বাহিনীর সাথে আছে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইহুদিবাদী ইসরাইলকে পরাজিত করবে।

প্রিয় দেশবাসী, এটা জেনে রাখুন এবং নিশ্চিত থাকুন এই ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি করা হবে না।

আপনাদের উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

যুদ্ধে প্রবেশ করলে আমেরিকার অপূরণীয় ক্ষতি হবে : ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী গত ১৮ জুন ২০২৫ দখলদার ইসরাইলের হামলার বিষয়ে বার্তা দিয়েছেন। এই বার্তাটি ইরানের রেডিও-টেলিভিশনসহ সব গণমাধ্যমে সম্প্রচারিত হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট আমাদের হুমকি দিচ্ছেন। হাস্যকর ভাষা ব্যবহার করে আমাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বলছেন। তারা এমন কাউকে হুমকি দিচ্ছে যারা তাদের হুমকিতে ভীত নয়। ইরানি জাতি হুমকিদাতাদের হুমকিতে ভীত নয়।

সর্বোচ্চ নেতা বলেন, ইরানি জাতিকে আত্মসমর্পণ করতে বলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ইরানি জাতি কীসের কাছে আত্মসমর্পণ করবে? আমরা কোনোভাবেই কারো আগ্রাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করব না। এটাই ইরানি জাতির যুক্তি, এটাই ইরানি জাতির চেতনা। আমেরিকা এই বিষয়ে [যুদ্ধ] প্রবেশ করলে তাতে তারাই শতভাগ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আমেরিকা এ ক্ষেত্রে যা ভোগ করবে তা ইরানের ক্ষতির চেয়ে অনেক বেশি। আমেরিকা এই (যুদ্ধের) ময়দানে সামরিকভাবে প্রবেশ করলে নিঃসন্দেহে তাদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

ইসরাইলি হামলার বিষয়ে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার দ্বিতীয় টিভি বার্তা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মহান ইরানি জাতিকে সালাম জানাচ্ছি। প্রথমে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই তা হলো সম্প্রতি শত্রুরা আমাদের দেশের জন্য যে পরিস্থিতি তৈরি করেছে তাতে আমাদের প্রিয় জাতির আচরণ প্রশংসার দাবি রাখে। ইরানি জাতি এটা দেখিয়েছে যে, তারা ভদ্র, সাহসী এবং সময় সচেতন। ঈদে গাদিরের উৎসবের দিন জনগণ যেভাবে অংশ নিয়েছে তা ছিল এক মহা পদক্ষেপ। গত কয়েক দিনে জনগণ যেসব সমাবেশ করেছে, জুমার নামাজে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি নামাজ পরবর্তী মিছিলে যেভাবে অংশ নিয়েছে তা ইরানি জাতির বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার বহিঃপ্রকাশ। এর সঙ্গে মিশে আছে সাহসিকতা এবং সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের যোগ্যতা। আল্লাহর কাছে এজন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে, তিনি এই ঈমানদার জাতিকে আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দিক থেকে এত বেশি সক্ষমতা দান করেছেন। দখলদার ইসরাইলের হামলার সময় টিভি উপস্থাপিকা (সাহার এমামি) যে চমৎকার ও অর্থপূর্ণ কাজটি করেছেন সেটাও এখানে উল্লেখ করতে চাই : 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি তোলা বিশেষ করে গোটা বিশ্বের কাছে ইরানি জাতির শক্তিমত্তা প্রদর্শন করা গুরুত্বপূর্ণ, এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল। এটা ছিল অনেক মূল্যবান একটা ঘটনা।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো– ইরানের কর্মকর্তারা যখন মার্কিন পক্ষের সাথে পরোক্ষ আলোচনা করছিলেন, তখনি আমাদের দেশে ইহুদিবাদী ইসরাইল ঘৃণ্য ও বোকামিপূর্ণ হামলা চালায়। ইরানের পক্ষ থেকে সামরিক পদক্ষেপের কোনো ধরনের ইঙ্গিত ছিল না। ইহুদীবাদী ইসরাইলের এই ঘৃণ্য পদক্ষেপে আমেরিকার সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে প্রথম থেকেই ধারণা করা হচ্ছিল, কিন্তু তাদের সাম্প্রতিক নানা বক্তব্য থেকে দিন দিনই এই ধারণা দৃঢ় হচ্ছে। ইরানি জাতি চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের মোকাবেলায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে, যেমনটি এখন পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করে এসেছে। ইরান চাপিয়ে দেওয়া শান্তির বিরুদ্ধেও দৃঢ় থাকবে। ইরান কারো কাছেই আত্মসমর্পণ করবে না। আমার প্রত্যাশা হলো চিন্তাবিদ, লেখক,

বক্তা বিশেষ করে বিশ্ব জনমতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এই বিষয়টিকে তুলে ধরবেন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবেন এবং সবার জন্য বিষয়টি স্পষ্ট করবেন। তারা (শত্রুরা) যেন তাদের প্রতারণাপূর্ণ প্রচারণার মাধ্যমে সত্য ও বাস্তবতাকে উল্টো ভাবে তুলে ধরার সুযোগ না পায়। দখলদার শত্রু ইহুদিবাদী ইসরাইল একটা বড় ভুল করেছে, একটা বড় অপরাধ করেছে, তাকে শাস্তি পেতে হবে। সে শাস্তি পাচ্ছে, এখনও শাস্তি পাচ্ছে। আমাদের জাতি এবং সশস্ত্র বাহিনী এই জঘন্য শত্রুকে শাস্তি দিয়েছে এবং এখনও শাস্তি দিয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতের জন্যও পরিকল্পনা রয়েছে। কঠিন শাস্তির ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ কারণে তাদের মার্কিন বন্ধুরা মাঠে নেমে কথা বলছে। এটা তাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

শেষ বিষয়টি হলো, সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট (ডোনাল্ড ট্রাম্প) হুমকির ভাষায় কথা বলা শুরু করেছেন। আমাদেরকে হুমকি দিচ্ছেন, অগ্রহণযোগ্য ও হাস্যকর ভাষায় ইরানি জাতিকে স্পষ্টভাবে বলছেন– আসুন আত্মসমর্পণ করুন! কেউ যখন এসব দেখে তখন আসলেই অবাক হয়ে যায়। প্রথমত কেবল তাকেই হুমকি দিতে হয় যে হুমকিতে ভয় পায়। ইরানি জাতি প্রমাণ করেছে তারা হুমকিদাতাদের হুমকিতে ভয় পায় না। ইরানি জাতি পবিত্র কুরআনের এই বক্তব্য বিশ্বাস করে : 'তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো তাহলে দুর্বল হয়ো না, মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না, তোমরাই (তাদের চেয়ে) ভালো অবস্থানে থাকবে।' ইরানি জাতির আচরণ ও চিন্তায় হুমকি প্রভাব ফেলবে না।

দ্বিতীয়ত, ইরানি জাতিকে আত্মসমর্পণ করতে বলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যেসব বুদ্ধিমান মানুষ ইরানকে চেনে, ইরানি জাতিকে চেনে, ইরানের ইতিহাস জানে তারা কখনোই এ ধরনের কথা বলতে পারে না। (ইরানি জাতি) কীসের কাছে আত্মসমর্পণ করবে? ইরানি জাতি আত্মসমর্পণ করার মতো জাতি নয়। আমরা কাউকে হামলা করিনি, কখনোই কারো হামলা মেনে নেব না। কারো হামলার কারণে আত্মসমর্পণ করব না। এটা ইরানি জাতির যৌক্তিক অবস্থান, এটাই ইরানি জাতির চেতনা। অবশ্যই মার্কিনিদের মধ্যে যারা আঞ্চলিক রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত তারা জানে এই ক্ষেত্রে আমেরিকা জড়ালে শতভাগ নিশ্চিত করে বলা যায়, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইরান যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার চেয়ে বহু গুণ বেশি ক্ষতির শিকার হবে তারা। তারা সামরিক দিক থেকে ময়দানে প্রবেশ করলে নিশ্চিতভাবে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আমি ইরানি জাতির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি– আপনারা এই পবিত্র আয়াতটিকে মনে রাখুন। আলহামদুলিল্লাহ, জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রয়েছে। শত্রুরা যাতে এমনটা ভাবতে না পারে যে, আপনারা ভয় পাচ্ছেন, দুর্বলতা অনুভব করছেন।

শত্রুরা যদি এটা অনুভব করে যে, আপনারা ভয় পান তাহলে তারা আপনাদেরকে ছাড়বে না। এখন পর্যন্ত আপনাদের আচরণ যেমন ছিল সেটাই দৃঢ়ভাবে অব্যাহত রাখুন। যাঁরা সেবামূলক দায়িত্বে রয়েছেন, জনগণের সঙ্গে যাঁরা সম্পৃক্ত, যাঁরা প্রচার ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সঙ্গে জড়িত তাঁদের সবাই দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন, 'বিজয় কেবল মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।' আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিতভাবে ইরানি জাতি এবং সত্য ও ন্যায়কে বিজয় দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

সূত্র : পার্সটুডে

ইরানের সর্বোচ্চ নেতার তৃতীয় টিভি বার্তা

ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধে ইরান বিজয়ী হয়েছে বলেছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেয়ী। তিনি বলেছেন, মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার মাধ্যমে ইরান আমেরিকার গালে 'কষে চড়' মেরেছে। যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধ থেকে কোনো সাফল্যই অর্জন করতে পারেনি। তারা না থাকলে ইসরাইল ধুলায় মিশে যেত। এসব কথা বলেন। ইরান-ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের দুদিন পর গত ২৯ জুন ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা এ কথাগুলো বলেন। ভিডিও বার্তায় তিনি ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জয় লাভ করায় ইরানি জনগণকে অভিনন্দন জানান।

আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেয়ী বলেন, ইহুদিবাদী সরকারের (ইসরাইলের) বিরুদ্ধে জয়ের জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইহুদিবাদীরা পরাজিত হয়েছে এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ধাক্কায় চূর্ণবিচূর্ণ ও ধ্বংস হয়েছে। ইহুদিবাদীরা অনেক উচ্চবাচ্য করলেও ইরানের ধাক্কায় পতনের দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছিল। তিনি বলেন, ইরানি জনগণের অসাধারণ ঐক্যকে আমি স্বাগত জানাই। ৯ কোটি জনগণের দেশ ইরান আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইরানিরা তাদের নিজেদের স্বতন্ত্র চরিত্র প্রদর্শন করেছে এবং প্রমাণ করেছে, যখন প্রয়োজন হবে তারা সবাই এক হবে।

ভিডিওতে আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী বলেন, 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র যে এমন হামলা চালাতে পারে, তা ইহুদিবাদী শাসকদের কল্পনাতেও ছিল না। তবু সেটাই ঘটেছে। মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা করেছেন। তাঁরা শত্রুর বহুস্তরবিশিষ্ট উন্নত প্রতিরক্ষা ভেদ করে ক্ষেপণাস্ত্র ও আধুনিক অস্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে শত্রুদের নগর ও সামরিক ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন। এ হামলা প্রমাণ করে, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের খেসারত হিসেবে ইহুদিবাদী শাসকদের চরম মূল্য দিতে হবে।'

যুক্তরাষ্ট্রের শাসনের বিরুদ্ধে ইরানের বিজয়ে অভিনন্দন জানিয়ে খামেনেয়ী বলেন, 'আমেরিকার শাসকগোষ্ঠী সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। কারণ, তারা মনে করেছিল তাদের হস্তক্ষেপ ছাড়া ইহুদিবাদী শাসন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁরা ইসরাইলকে রক্ষা করতে যুদ্ধে নেমেছিল, কিন্তু এই যুদ্ধে তারা কিছুই অর্জন করতে পারেনি।'

ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর উপর মার্কিন হামলার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই হামলা অবশ্যই আন্তর্জাতিক আদালতে স্বাধীন আইনি পদক্ষেপের দাবি রাখে। তবে তারা এতে উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য পায়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘটনার বর্ণনায় অতিরঞ্জন করেছেন... আসলে তাঁরা কিছুই অর্জন করতে পারেননি, তাঁদের লক্ষ্যও পূরণ হয়নি।'

আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী বলেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্র তাদের প্রয়োজনে এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলোতে যখন ইচ্ছা তখন পৌঁছাতে পারে। এটা মোটেও ছোট কোনো বিষয় নয়। ভবিষ্যতেও এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। আগ্রাসন চালানো হলে আগ্রাসনকারীদের অবশ্যই চড়া মূল্য দিতে হবে।

ইরানের 'আত্মসমর্পণের' বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমি জোর দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করতে চাই, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, "ইরানকে অবশ্যই আত্মসমর্পণ করতে হবে।" আত্মসমর্পণ। বিষয়টি এখন ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বা পারমাণবিক শিল্প নিয়ে নয়, এটি এখন শুধু ইরানের আত্মসমর্পণের ব্যাপার।'

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেন, ইসলামি বিপ্লবের শুরু থেকেই মার্কিনরা ইরানের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত ও দীর্ঘদিন ধরে ইরানের সঙ্গে টক্কর দিয়ে আসছে। প্রতিবার তারা নতুন কোনো অজুহাত তোলে। কখনো মানবাধিকার, কখনো গণতন্ত্র রক্ষা, কখনো নারীর অধিকার, কখনো ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ, কখনো স্রেফ পারমাণবিক বিষয় আবার কখনো ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন। নানা অজুহাত দেখালেও আসলে মূল কথা একটাই, ইরানের আত্মসমর্পণ। আগের আমেরিকান কর্মকর্তারা সরাসরি তা বলেননি, কারণ তা গ্রহণযোগ্য নয়।

কোনো জাতিকে 'এসো আত্মসমর্পণ করো' বলার কোনো যুক্তি নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আগে তারা আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত কথা অন্য কথার মাধ্যমে আড়াল করত। এই ব্যক্তি (ডোনাল্ড ট্রাম্প) সেই সত্য উদ্ঘাটন করেছেন এবং স্পষ্ট করেছেন, মার্কিনরা কখনো ইরানের আত্মসমর্পণের বিকল্প কিছু মেনে নেবে না। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইরানি জনগণকে জানতে হবে, এটাই আমেরিকার সঙ্গে সংঘাতের প্রকৃতি। এটি ইরানের প্রতি আমেরিকার একটি বড় অপমান। এমনটি কখনো ঘটবে না, কখনোই ঘটবে না। সূত্র: তেহরান টাইমস

ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিজয়ের পেছনে ছিল 'মজবুত প্রতিরক্ষা ও জাতীয় ঐক্য' : ড. পেজেশকিয়ান

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান ইহুদিবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে ১২ দিনের যুদ্ধে বিজয়কে দেশের 'শক্তিশালী প্রতিরক্ষা সক্ষমতা এবং অটুট জাতীয় ঐক্যের ফল' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই দুটি উপাদানই ইসরাইলি আগ্রাসন মোকাবেলায় ইরানকে সফল করেছে।

প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান গত ১৩ জুলাই তেল মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের সময় যুদ্ধকালীন জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, 'আপনারা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ সঠিক বোঝাপড়া ও যুদ্ধ পরিস্থিতি সঠিকভাবে অনুধাবন করে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়ে শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছেন।'

ইরানের প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, 'জনগণের ঐক্য, ময়দানে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা ও ক্ষেপণাস্ত্রই শক্তি- ইসরায়েলের দম্ভকে চূর্ণ করেছে। এসব ছাড়া বিজয় অর্জন সম্ভব হতো না।'

পেজেশকিয়ান ভবিষ্যতে যুদ্ধ এড়াতে কূটনীতিকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরে বলেন, 'যুদ্ধ কারো জন্যই মঙ্গল বয়ে আনে না এবং এর প্রকৃত কোনো বিজয়ী থাকে না। আমরা শান্তি, স্থিতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের কৌশল হলো–জাতীয় ঐক্য, অভ্যন্তরীণ সংহতি এবং প্রতিবেশী ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।'

তিনি সাফ জানিয়ে দেন, 'আমরা আগ্রাসনে বিশ্বাসী নই এবং এমন কিছু করারও ইচ্ছা নেই। তবে হুমকি ও চাপে আমরা মাথা নত করব না এবং দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলব।

উল্লেখ্য, ১৩ জুন ইসরাইল বিনা উসকানিতে ইরানের ওপর বর্বর আগ্রাসন চালায়, যাতে বহু শীর্ষ সামরিক কমান্ডার, পারমাণবিক বিজ্ঞানী এবং সাধারণ নাগরিক নিহত হন। এক সপ্তাহ পর, যুক্তরাষ্ট্রও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং জাতিসংঘ সনদ, আন্তর্জাতিক আইন এবং পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (এনপিটি) লঙ্ঘন করে ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনা বোমা হামলার মাধ্যমে ধ্বংস করে। এর পাল্টা জবাবে ইরান সশস্ত্র বাহিনী ইসরাইল অধিকৃত অঞ্চলজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনা এবং কাতারের আল-উদেইদ মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা চালায়, যা পশ্চিম এশিয়ার সবচেয়ে বড় মার্কিন ঘাঁটি।

২৪ জুন, ইসরাইল কোনো শর্ত ছাড়াই একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেয়, যা শক্তিশালী ও অনড় ইরানি প্রতিশোধের মুখে তাদের পরাজয়ের পরিষ্কার ইঙ্গিত বহন করে। - পার্সটুডে

শক্ত জবাব দিয়েছি, আবার হামলা হলে কঠোর জবাব দেব : ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান

ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল সাইয়্যেদ আব্দুর রহিম মুসাভি বলেছেন, ইরান যুদ্ধ শুরু করেনি, তবে হামলাকারীকে সর্বশক্তি দিয়ে জবাব দিয়েছে। যেহেতু যুদ্ধবিরতিসহ শত্রুর প্রতিশ্রুতি মেনে চলার বিষয়ে ব্যাপক সন্দেহ রয়েছে, সে কারণে পুনরায় হামলার কঠোর জবাব দিতে ইরান প্রস্তুতি নিয়েছে।

বার্তা সংস্থ ইরনা'র বরাত দিয়ে পার্সটুডে জানিয়েছে, ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল সাইয়্যেদ আব্দুর রহিম মুসাভি সৌদি আরবের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খালিদ বিন সালমানের সাথে টেলিফোনে কথা বলেছেন।

এ সময় ইহুদিবাদী ইসরাইল এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ১২ দিনের যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি বলেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সংযম দেখিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পরোক্ষ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল। এরপরও ইরানে আগ্রাসন চালিয়ে ইহুদিবাদী ইসরাইল এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রমাণ করেছে তারা কোনো আন্তর্জাতিক আইন এবং নিয়ম-নীতি মেনে চলে না। চাপিয়ে দেওয়া ১২ দিনের যুদ্ধে বিশ্বের কাছে এই বাস্তবতা স্পষ্ট হয়েছে।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান আরও বলেছেন, আমরা জবাব দিয়েছি, আবারও এমনটা ঘটলে শক্ত জবাব দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি।

টেলিফোনে কথা বলার সময় সৌদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী খালিদ বিন সালমান বলেন, সৌদি সরকার আগ্রাসনের নিন্দা করেই থেমে থাকেনি; বরং যুদ্ধ ও আগ্রাসন বন্ধ করার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

সৌদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী সাম্প্রতিক যুদ্ধে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর বেশ কয়েকজন কমান্ডারের শহিদ হওয়ায় শোক প্রকাশ করেন। সূত্র : পার্সটুডে

ইরানে ইসরাইল-আমেরিকার আগ্রাসনে শহিদদের জানাজা অনুষ্ঠানে জনতার ঢল

ইহুদিবাদী ইসরাইল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১২ দিনের সামরিক আগ্রাসনে শহিদদের স্মরণে ইরানের রাজধানী তেহরানে রাষ্ট্রীয়ভাবে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

তেহরান সময় শনিবার (গত ২৮ জুন ২০২৫) সকাল ৮টায় এই বিশাল জানাজা শুরু হয় শহরের কেন্দ্রস্থল ইনকেলাব চত্বরে যা ১১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আজাদি স্কয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই জানাজায় ৬০ জন পরমাণু বিজ্ঞানী, সামরিক কমান্ডার ও বেসামরিক নাগরিকের কফিন স্থান পায়। শহিদদের কফিন ইরানের জাতীয় পতাকায় মোড়ানো ছিল এবং অনেকের ছবি ও সামরিক পোশাক সংবলিত ব্যানারও প্রদর্শিত হয়।

জানাজায় অংশ নেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, আইআরজিসির কুদস ফোর্সের প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইসমাইল কায়ানি এবং অন্য উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা।

বিপুলসংখ্যক শোকসন্তপ্ত জনতা কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে 'ইসরাইল ধ্বংস হোক', 'আমেরিকা ধ্বংস হোক' স্লোগান দেন এবং নানা প্রতিবাদী প্ল্যাকার্ড বহন করেন। একটি ব্যানারে লেখা ছিল : 'বুম বুম তেল আবিব'– যা ইরানের পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ইঙ্গিত দেয়।

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাকায়ি জানাজায় অংশ নিয়ে 'শহীদদের প্রতি ইরানি জাতির অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অশ্রুসিক্ত ভালোবাসা' তুলে ধরেন।

পরে এক এক্স (টুইটার) বার্তায় তিনি লিখেন, আজ ইরানের দেশপ্রেমী জনতা তাদের সবচেয়ে নিষ্ঠাবান ও দেশপ্রেমিক সন্তানদের–কমান্ডার, বুদ্ধিজীবী, ক্রীড়াবিদ, নারী ও শিশুদের–কাঁধে তুলে নিয়েছে। আজ ইরানের সাহসী জনগণ তাদের এক একটি পবিত্র দেহকে বীরের মতো শ্রদ্ধার সাথে মাতৃভূমির মাটিতে সমাহিত করছে।

তেহরান ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল-এর প্রধান মোহসেন মাহমুদি এই দিনটিকে 'ইসলামি ইরান ও বিপ্লবের ইতিহাসে এক গৌরবময় দিন' বলে আখ্যা দেন।

শহিদদের মধ্যে রয়েছেন ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ বাকেরি, যিনি তাঁর স্ত্রী ও সাংবাদিক কন্যাসহ তেহরানে ইসরাইলি হামলায় শহিদ হন।

পরমাণু বিজ্ঞানী ড. মোহাম্মদ মেহদি তেহরানচি ও তাঁর স্ত্রী, আইআরজিসির প্রধান কমান্ডার হোসেইন সালামি এবং আরও অন্তত ৩০ জন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা ও ৪ শিশু।

ইরানি কর্তৃপক্ষ জানায়, ১২ দিনের এই আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত ৬০০-রও বেশি মানুষ শহিদ হয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক।

এই বিশাল জানাজা অনুষ্ঠিত হলো মুহররম মাসের দ্বিতীয় দিনে– যে মাসে কারবালার বীর শহিদ ইমাম হুসাইন (আ.) ও তাঁর সাথিদের স্মরণ করা হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বাকায়ি বলেন, ইরানিরা প্রমাণ করেছে, তারা ইমাম হুসাইনের জাতি, যারা সত্য-মিথ্যার যুদ্ধে ইমান, ধৈর্য ও জাতীয় ঐক্যের শক্তিতে যেকোনো শত্রুকে পরাজিত করতে সক্ষম।

সূত্র : পার্সটুডে

বিশ্ব গণমাধ্যমে ইসরাইলি আগ্রাসনে ইরানের শহিদদের ঐতিহাসিক শেষ বিদায়ের খবর

ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে ৬০ জন শহীদের শেষ বিদায়ের অনুষ্ঠানে হাজার হাজার ইরানির বিশাল উপস্থিতি, যার মধ্যে সামরিক কমান্ডার এবং পারমাণবিক বিজ্ঞানীরাও ছিলেন, এ ব্যাপারে বিশ্বের বৃহত্তম গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে।

ইরান এবং ইরানিদের নাম আবারও বিশ্বের অনেক সংবাদ মাধ্যমের প্রধান শিরোনাম হয়ে উঠেছে। ইরানিরা আবারও সামনে এসে দেখিয়েছে যে, তারা কেবল শুধু যে আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে তাই নয়, একই সাথে তাদের শহিদ, মহান সেনা কমান্ডার এবং পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের রক্তের জন্য চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।

এক বিস্তারিত প্রতিবেদনে তুর্কি টিআরটি টেলিভিশন নেটওয়ার্ক শেষ বিদায়ের অনুষ্ঠানকে 'ঐতিহাসিক' বলে অভিহিত করে এ অনুষ্ঠানে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে।

চ্যানেল ফ্রান্স-২৪ ইরানের বিরুদ্ধে ইসরাইলি আগ্রাসনে শহিদদের শেষ বিদায় অনুষ্ঠানে হাজার হাজার ইরানির বিশাল উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে যোগ করেছে যে জেনারেল সালামি, জেনারেল হাজিজাদেহ এবং জেনারেল বাকেরির মতো সিনিয়র কমান্ডারদের শেষ বিদায় জানানো হয়।

সিএনএন ছিল অন্যান্য মিডিয়া আউটলেটগুলোর মধ্যে একটি যারা শহিদদের বিদায় জানাতে ইরানি জনগণের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসও এই বিদায় অনুষ্ঠানে 'হাজার হাজার' ইরানির উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছে। রাশিয়ান মিডিয়াও এই অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য মিডিয়াতে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে।

এই অনুষ্ঠানটি অনেক আরব মিডিয়ারও শিরোনাম হয়ে উঠেছে। আল জাজিরা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক এই অনুষ্ঠানের কিছু অংশ সরাসরি সম্প্রচার করেছে। ইরানের বিরুদ্ধে ইসরাইলি আগ্রাসনে শহিদদের জানাজা অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা অন্যান্য মিডিয়ার মধ্যে আল আরাবিয়াও ছিল।

ইরানের বিরুদ্ধে আগ্রাসনে ইসরাইল ইরানের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট কমান্ডার এবং গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক বিজ্ঞানীকে শহিদ করে, যার মধ্যে রয়েছেন আইআরজিসির সর্বাধিনায়ক জেনারেল সালামি।

ইসরাইল ইরানের বৈজ্ঞানিক ও সামরিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের শহিদ করে এই দেশের উপর তার বিজয়ের পথ সুগম করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা শুধু যে কেবল তাদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়নি একই সাথে বিশেষজ্ঞদের মতে, তারা ইরানের কাছ থেকে আরও মারাত্মক আঘাত পেয়েছে।

ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তেল আবিব ও হাইফাসহ অধিকৃত অঞ্চলের অনেক অংশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে এবং হাজার হাজার ইহুদিবাদী বসতি স্থাপনকারীকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেছে।

১২ দিন পর, ইসরাইল অবশেষে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু এ কদিনে ইরানিদের ঐক্যকে শতগুণ বৃদ্ধি করেছে।

সূত্র : পার্সটুডে

ইসরাইলের নৃশংস হামলায় ইরানে ৪৪ নারী ও ১৩ শিশু নিহত

ইসরাইলের ১২ দিনের অব্যাহত নৃশংস হামলায় ইরানে কয়েক ডজন নারী ও শিশুর শহিদ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইরানের একজন জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা। একই সাথে বেসামরিক নাগরিকদের উপর ইহুদি শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত অপরাধের নিন্দা জানিয়েছেন তিনি।

ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের প্রধান হোসেইন কেরমানপুর সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া একটি পোস্টে জানিয়েছেন, ইসরাইলি আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরাইলি হামলায় ৪৪ জন ইরানি নারী শহিদ এবং ১৬৩ জন নারী আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দুই গর্ভবতী মা এবং তাদের অনাগত সন্তান রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, শহিদদের মধ্যে ১৩ জন শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট শিশুটির বয়স মাত্র দুই মাস। আহতদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট শিশুটির বয়স চার বছর এবং বর্তমানে সে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রয়েছে। তার শরীরের ৫০ভাগ পুড়ে গেছে। শিশুটির মা ডাঃ রাসৌলি একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। শিশুটির বাবা তার দুই মাস বয়সী বোনের সাথে শহিদ হয়েছেন।

বেসামরিক নাগরিকদের উপর ইহুদিবাদী ইসরাইলের নির্বিচার বোমাবর্ষণ দেশটির সামরিক বাহিনীর বর্বরতা এবং অমানবিকতাকে উন্মোচিত করে চলেছে। ওয়াশিংটনের অটল সমর্থন এই নৃশংসতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

সূত্র : তাসনিম নিউজ এজেন্সি

ইসরাইলি আগ্রাসনে শহিদ ৯ ইরানি সাংবাদিক

ইরানের একটি সংস্থা এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রতিক ১২ দিনের যুদ্ধে নয়জন সাংবাদিক শহিদ হয়েছেন।

বাসিজ মিডিয়া অর্গানাইজেশনের প্রধান মোর্তেজা কার আমুজিয়ান শনিবার তেহরানে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও টার্গেট হামলায় দেশের নয়জনেরও বেশি সাংবাদিক শহিদ হয়েছেন।'

তিনি আরও বলেন, ১২ দিনের এই যুদ্ধে ১০ জনেরও বেশি সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসা এখনও চলছে।

কার আমুজিয়ান আরও উল্লেখ করেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) সংবিধির ৮ অনুচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী, সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ একটি যুদ্ধাপরাধ। এই মিডিয়াবিরোধী অপরাধকে বিশ্ব মিডিয়ার উপেক্ষা করা উচিত নয়। বাসিজ মিডিয়া অর্গানাইজেশন সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় এই ধরনের হামলার পেছনে থাকা অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য আইনি এবং আন্তর্জাতিক বিচারের চেষ্টা করবে। সূত্র : মেহর নিউজ

ইরানের টিভি উপস্থাপিকা সাহার এমামিকে ভেনিজুয়েলার 'সিমন বলিভার' পুরস্কার প্রদান

ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ইরানের সাহসী সাংবাদিক ও উপস্থাপক সাহার এমামি এবং ইরানের রেডি-টিভি ভবনে ইসরাইলি হামলায় শহীদদেরকে বিশেষ 'সিমন বলিভার অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করেছেন।

গত ১৬ জুন সোমবার ইহুদিবাদী ইসরাইল ইরানের জাতীয় সম্প্রচার সংস্থা আইআরআইবি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা চালায়। এই হামলার সময়ও টিভি চ্যানেলের লাইভ অনুষ্ঠান চালাতে থাকেন সাহার এমামি। হামলার সময়ও তিনি উপস্থাপনা অব্যাহত রাখায় ইরানসহ গোটা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে।

পার্সটুডে জানিয়েছে, জাতীয় সাংবাদিক দিবসে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো উপস্থাপিকা সাহার এমামির পাশাপাশি ইরানের আইআরআইবি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ইহুদিবাদী হানাদারদের নৃশংস আক্রমণে শহিদদের বিশেষ 'সিমন বলিভার' পুরস্কার প্রদান করেছেন।

ভেনিজুয়েলায় নিযুক্ত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত আলি চেগিনি সাহসী উপস্থাপিকা সাহার এমামি এবং মিডিয়া শহিদদের পরিবারের পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন এবং ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে সিমন বলিভার পুরস্কার গ্রহণ করেন।

ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ঐ অনুষ্ঠানে ইরানি জাতি, সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিরোধের প্রশংসা করেন এবং ইরানি জাতির চূড়ান্ত বিজয়ের উপর জোর দেন। 'সিমন বলিভার' পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানে সবাই করতালি দিয়ে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানটি ভেনিজুয়েলার বেশ কয়েকটি জাতীয় চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

সূত্র : পার্সটুডে

হজের তাৎপর্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

হজ ইসলাম ধর্মের অন্যতম ফরজ ইবাদত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহ জগতের প্রতি অমুখাপেক্ষী।– সূরা আলে ইমরান : ৯৭

অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে, 'এবং মানুষের মাঝে হজের ঘোষণা দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটসমূহের পিঠে (সওয়ার হয়ে), তারা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে, যাতে তারা তাদের কল্যাণের জন্য উপস্থিত হতে পারে।'– সূরা হজ : ২৭-২৮

আর হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, ইবনে আববাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আকরা বিন হাবেস নবী করীম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! হজ কি প্রতি বছর ফরজ নাকি জীবনে একবারই ফরজ?' তিনি বললেন, 'না, বরং হজ জীবনে একবার ফরজ। যে অধিক করবে তা তার জন্য নফল হবে।'

ইসলামের প্রতিটি বিধানের পেছনেই তাৎপর্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে। হজেরও তেমনি গভীর তাৎপর্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন : হজ তাওহিদের প্রতীক, এটি মানুষকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, হজ ঐক্যের প্রতীক, হজ মানুষকে অল্পতে সন্তুষ্ট থাকার প্রশিক্ষণ দেয় ইত্যাদি। আলেমগণ পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী (সা.)-এর হাদিসের মাধ্যমে হজের অনেক তাৎপর্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এসবের মধ্য থেকে কয়েকটি সম্পর্কে নিচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো :

১. তাওহিদের প্রতীক : ইহরাম বাঁধার প্রথম মুহূর্ত থেকেই হজ হলো তাওহিদের প্রতীক। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আল আনসারি (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হজের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, অতঃপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে তাওহিদের ঘোষণা দেওয়া শুরু করলেন, 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুল্‌ক, লা শারীকা লাক (আমি হাজির, হে আল্লাহ, আমি হাজির, তোমার কোনো অংশীদার নেই, আমি উপস্থিত। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত তোমার এবং সমস্ত রাজত্বও, তোমার কোনো অংশীদার নেই)।'– সহিহ মুসলিম

২. ঐক্যের প্রতীক : হজ ঐক্যের প্রতীক। কারণ, হজ সকল মানুষকে তাদের পোশাকে, কাজে, আচার-অনুষ্ঠানে এক করে তোলে। রাজা বা দাস, ধনী বা দরিদ্র, সবাই একই রকম। অধিকার ও কর্তব্যের দিক থেকেও সকল মানুষ সমান। এই পবিত্র স্থানে বর্ণ ও জাতীয়তার পার্থক্য কোনো ব্যাপার নয়; তাদের মধ্যে পার্থক্য করার অধিকার কারো নেই। কোনো আরব অনারবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় এবং কোনো শ্বেতাঙ্গ একজন কৃষ্ণাঙ্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, (শ্রেষ্ঠত্ব) কেবল তাকওয়ার দিক থেকে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা কুফরি করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ হতে ও মসজিদুল হারাম হতে; যাকে আমি করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সবারই জন্য সমান।...' [সূরা হজ: ২৫]

লক্ষ লক্ষ মুসলিম একই জায়গায় দাঁড়িয়ে, একই পোশাক পরে, একই লক্ষ্যে, একই স্লোগানে এক প্রভুকে ডাকছে এবং এক নবীর অনুসরণ করছে... এর চেয়ে বড় ঐক্য আর কী হতে পারে?

৩. মৃত্যু ও আখেরাতের স্মরণ : হজের সময় প্রত্যেক হাজিকে সাদা পোশাক পরিধান করতে হয়। মৃত ব্যক্তিকে একই ধরনের কাপড়ে কাফন পরানো হয় বলে এটি মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যেন সে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। অপর দিকে যখন সকল হাজি আরাফার ময়দান ও অন্যান্য স্থানে কোনোরকম ভেদাভেদ ছাড়াই একত্রিত হন তখন তা তাঁদেরকে হাশরের ময়দান তথা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

৪. আল্লাহর আইনের প্রতি আত্মসমর্পণ : মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা হলো আল্লাহর ইবাদত এবং দাসত্বের বাহ্যিক প্রকাশ। এটি তাঁর আদেশ ও আইনের প্রতি আত্মসমর্পণ। কেউ ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করে না। এটি উম্মাহর ঐক্য এবং ইসলামের একক ব্যবস্থার সত্যতা প্রমাণ করে।

৫. নবী-রাসূলদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার অনুভূতি : হজ পালনের

মাধ্যমে একজন হাজি মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহিম (আ.), যিনি এই ঘর নির্মাণ করেছিলেন, তাঁর থেকে শুরু করে আমাদের নবী ও আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাথে সংযোগের অনুভূতি লাভ করেন এবং পবিত্র মক্কার নগরীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পায়। যখন একজন হাজি পবিত্র স্থানগুলোতে যান এবং আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন, তখন তিনি এই পবিত্র স্থানে সেই সকল নবী-রাসূলের সফরের কথা মনে করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে মক্কা ও মদিনার মধ্যে ভ্রমণ করছিলাম এবং আমরা একটি উপত্যকা অতিক্রম করছিলাম। তিনি বললেন, 'এটি কোন্ উপত্যকা?' তারা বলল, 'আজরাকের উপত্যকা।' তিনি বললেন, 'আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহর রাসূল মূসা (আ.) কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন, তালবিয়া পাঠ করছেন এবং এই উপত্যকা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন।'

তারপর আমরা চলতে চলতে একটি পাহাড়ি গিরিপথে পৌঁছলাম। তিনি বললেন, 'এটা কোন্ পাহাড়ি গিরিপথ?' তারা বলল, 'হারশা।' তিনি বললেন, 'আমি যেন হযরত ইউনুসকে একটি পশমি আলখাল্লা পরিধান করে লাল উট– যার লাগাম খেজুরের তন্তু দিয়ে তৈরি, সেটার পিঠে চড়ে এই উপত্যকা দিয়ে তালবিয়া পাঠ করতে করতে যেতে দেখতে পাচ্ছি।'– সহিহ মুসলিম

৬. বিনয়ী হওয়া : হাজিদের পোশাকের শুভ্রতা ও পরিচ্ছন্নতা যেন অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও হৃদয়ের পবিত্রতা এবং বাণী ও পদ্ধতির পবিত্রতার লক্ষণ। এর অর্থ হলো সমস্ত সাজসজ্জা বাদ দেওয়া এবং বিনয় প্রদর্শন করা।

৭. শালীন পোশাক ও অল্প জায়গায় তুষ্টি : হজ মানুষকে শালীন পোশাকে এবং অল্প জায়গায় সন্তুষ্ট থাকতে শেখায়, যখন সে দুটি মাত্র কাপড় পরিধান করে এবং এটি তার জন্য যথেষ্ট মনে করে আর তার থাকার ব্যবস্থা হয় কেবল তার ঘুমানোর জন্য যতটুকু জায়গার প্রয়োজন।

৮. কাফিরদেরকে ভীত করে তোলা : মুসলমানদের এই বিশাল সমাবেশের মাধ্যমে কাফির ও পথভ্রষ্টদের ভীত করে তোলা হয়। যদিও মুসলমানরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে তারা একত্রিত হয়। এটি তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শক্তিকে প্রকাশ করে।

৯. সংঘবদ্ধতা ও সম্প্রীতির চেতনা : সাধারণত প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মতো করে সফর করে থাকে, যেখানে হজে আমরা লোকদেরকে দলবদ্ধভাবে আসতে দেখি। এটি মুসলিমদেরকে সংঘবদ্ধ হওয়া ও নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার চেতনা যোগায়। হজ মুসলমানদের পারস্পরিক বন্ধনকে জোরদার করে।

১০. মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক অবগতি : হজে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ থেকে হাজিরা উপস্থিত হন। এতে সরাসরি তাঁদের নিকট থেকে তাঁদের দেশ ও মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, যেখানে তথ্যগত বিভ্রান্তির অবকাশ থাকে না।

১১. অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সহযোগিতার গুরুত্ব অনুধাবন : হজে আগত মুসলমানগণ পরস্পরের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। সকল দেশের বিজ্ঞ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের পারস্পরিক সাক্ষাতে মুসলমানদের চাহিদা, সুবিধা-অসুবিধার বিষয়গুলো জানা যায় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্বও অনুধাবন করা সম্ভব হয়।

হজে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ থেকে হাজিরা উপস্থিত হন। এতে সরাসরি তাঁদের নিকট থেকে তাঁদের দেশ ও মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, যেখানে তথ্যগত বিভ্রান্তির অবকাশ থাকে না।

১২. পাপের ক্ষমা : মহানবী (সা.) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি হজ করে এবং কোনো অশ্লীল কথা না বলে বা কোনো পাপ না করে, সে পাপ থেকে পবিত্র হয়ে ফিরে যাবে যেমনভাবে তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।'

১৩. পাপ ও খারাপ অভ্যাস ত্যাগ : হজ পাপকারীদের জন্য আশার দরজা খুলে দেয় এবং তাদেরকে এই পবিত্র স্থানে পাপ ত্যাগ করতে শেখায়।

১৪. নিয়মানুবর্তীতা ও সময়ানুবর্তীতার প্রশিক্ষণ : হজের সময় নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান নির্দিষ্টভাবে ও সুনির্দিষ্ট সময়ে পালন করতে হয় বলে হাজিরা নিয়মানুবর্তীতা ও সময়ানুবর্তীতার প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।

১৫. আল্লাহর রাস্তায় খরচে উৎসাহ : হজ পালনের জন্য যাতায়াত ও ভ্রমণ, থাকা-খাওয়া, দান-সদকা, কুরবানি এবং অন্যান্য খাতে হাজিকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাই এটি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে এবং কৃপণতাকে পরিহার করতে শেখায়।

১৬. ধনীদের প্রশিক্ষণ দান : হজ ধনীদেরকে তাদের স্বতন্ত্র পোশাক ও বাসস্থান ত্যাগ করার প্রশিক্ষণ দেয় এবং তাওয়াফ, সাঈ ও জামারাতের পাথর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে দরিদ্রদের সাথে সমান গণ্য করে। এভাবে এটি ধনীদেরকে বিনয়ী হতে এবং পার্থিব জীবনের তুচ্ছতা উপলব্ধি করতে শেখায়।

১৭. ইবাদতের প্রশিক্ষণ দান : হজের দিনগুলিতে হজযাত্রী আল্লাহর ইবাদত ও স্মরণে অবিচল থাকে, এক পবিত্র স্থান থেকে অন্য পবিত্র স্থানে, এক কর্ম থেকে অন্য কর্মে যান। এটি আল্লাহর ইবাদত ও স্মরণে এক ধরনের নিবিড় প্রশিক্ষণ।

১৮. মানুষের প্রতি সদয় হওয়ার প্রশিক্ষণ দান : হজের সময় হাজিরা পথভ্রষ্টদের পথ দেখান, অজ্ঞদেরকে শিক্ষা দেন,

দরিদ্রদেরকে সাহায্য করেন এবং প্রতিবন্ধী ও দুর্বলদের সহায়তা করে থাকেন।

১৯. ধৈর্যশীলতার প্রশিক্ষণ : হজ মানুষকে ধৈর্যশীল হওয়ার এবং মানুষের বিরক্তি সহ্য করার মতো ভালো গুণ বিকাশ করার প্রশিক্ষণ দেয়। কারণ, হাজি অনিবার্যভাবে ভিড় এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাবলির সম্মুখীন হন। আল্লাহ বলেন, 'সুবিদিত মাসে (যথা : শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজে) হজ হয়। সুতরাং যে কেউ এই মাসগুলোতে হজ করার সংকল্প করে, সে যেন হজের সময় স্ত্রী-সহবাস (কোনো প্রকার যৌনাচার), পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে।'– সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৯৭

২০. কষ্টসহিষ্ণু হওয়ার প্রশিক্ষণ : হজ গরম বা শীত, দীর্ঘ দূরত্ব, পরিবারের সদস্যদের থেকে দূরে থাকা, পবিত্র স্থানগুলোর মধ্যে ঘোরাফেরা এবং জনাকীর্ণ অবস্থার মতো অসুবিধা সহ্য করার মাধ্যমে কষ্টসহিষ্ণু হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়।

২১. আত্মত্যাগের শিক্ষা : হজের মাধ্যমে মানুষ নিজের স্বাভাবিক অভ্যাস ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধের জিনিসগুলো ত্যাগ করতে শেখে। কারণ, হজযাত্রীকে তার মাথা খোলা রাখতে হয়, তাঁর নিয়মিত পোশাক ত্যাগ করতে হয় এবং তার অভ্যস্ত থাকার ব্যবস্থা, খাবার ও পানীয় ত্যাগ করতে হয়।

২২. মর্যাদা বৃদ্ধি : যখন হাজি সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করেন, তখন তিনি মনে রাখেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর উপর ভরসা করে এবং তাঁর দিকে ফিরে আসে, তিনি তাকে হতাশ করবেন না; বরং তিনি তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। যখন ইসমাঈল (আ.)-এর মা হযরত হাজেরা ইবরাহিম (আ.)-কে বললেন, 'আল্লাহ কি আপনাকে এটা করার নির্দেশ দিয়েছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' হযরত হাজেরা বললেন, 'তাহলে তিনি আমাদের হতাশ করবেন না।' মহান আল্লাহ হযরত হাজেরার মর্যাদা বৃদ্ধি করলেন। তাঁর স্মরণে মহান আল্লাহ নবি-রাসূলগণসহ সকল হাজিকে দুটি পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়াতে নির্দেশ দিলেন, যেমনটি হযরত হাজেরা করেছিলেন।

২৩. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া : যত বড় উদ্বেগ এবং কষ্টই হোক না কেন, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হজের অন্যতম লক্ষ্য। কারণ, মুক্তির পথ আল্লাহর হাতে। হযরত ইসমাঈলের মা তাঁর পিপাসার্ত ছেলের মৃত্যুর আশংকায় পানির সন্ধানে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে দৌড়াতে শুরু করলেন। আর পানি এমন এক উৎস থেকে তাঁর কাছে এলো যা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। সেই জমজমের পানি কেবল তৃষ্ণাই নিবারণ করে না; বরং এর মধ্যে রয়েছে দেহ-মনের আরোগ্য।

২৪. আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেওয়া : হাজি মনে রাখেন যে, হজ কোনো সরকার বা সংগঠন, রাজা বা রাষ্ট্রপতির আহ্বানে অনুষ্ঠিত হয় না; বরং এটি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের আহ্বান, যিনি এটিকে এমন একটি উপলক্ষ্য করে তুলেছেন যেখানে মুসলমানরা আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমতার ভিত্তিতে এক জায়গায় মিলিত হয়।

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর মেহমান তিনজন : আল্লাহর পথে যোদ্ধা, হজ পালনকারী হাজি এবং ওমরা পালনকারী হাজি।'– নাসায়ী

২৫. হজ হলো শিরক ও কাফিরদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা : হজ হলো শিরক ও কুফর থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং কাফিরদের সাথেও সম্পর্কছেদ। কাফির মুশরিকদের জন্য যেকোনো সময় মসজিদুল হারামে প্রবেশ নিষিদ্ধ, তাদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন। মহান আল্লাহ বলেন : 'হে বিশ্বাসিগণ! অংশীবাদীরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে।'– সূরা তাওবা : ২৮

সংকলনে : মো. আশিফুর রহমান

সূত্র: ইন্টারনেট

সমগ্র বিশ্বের নারী জাতির আদর্শ হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)

ড. নুসরাত ফাতেমা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলাম নারীকে দিয়েছে সম্মান ও মর্যাদা এবং সমাজে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত'। একজন মায়ের মর্যাদাকে এভাবে প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম নারীকে দিয়েছে সম্মানের আসন। জাহেলি যুগের সমাজচিত্র অবলোকনে দেখা যায় কোনো গোত্রে কন্যা শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তাদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ত। কুরাইশ গোত্রের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তারা কন্যা সন্তানকে হত্যা করত। এ সম্পর্কে আল-কোরআনে বলা হয়েছে- তখন তাদের চেহারা হয়ে যেত কালো, আর তারা হয়ে পড়ত ক্লিষ্ট মানসিকতাসম্পন্ন।[১] নারীর প্রতি উদার ও সহনশীল আচরণ করে তাকে সমাজে মর্যাদাশীল অবস্থান দেওয়াকে ইসলাম বরাবরই উৎসাহিত করেছে। সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ও উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিয়ে, দেনমোহর, তালাক ইত্যাদি বিষয়ে একজন নারীর অধিকার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

ইসলাম যেমন নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছে নারীরও রয়েছে তেমনি ইসলামের প্রতি দায়িত্বশীলতা। ইসলামি ঐতিহ্যকে সুরক্ষিত ও সমুন্নত করে ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী নিজস্ব জীবন পরিচালনা করা।

পরিবার ও সমাজে রয়েছে একজন নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সন্তানের প্রথম শিক্ষক একজন মা। পরিবারের প্রাথমিক শিক্ষাই ভবিষ্যৎ জীবনের সোপান। এক্ষেত্রে একজন আদর্শ মায়ের ভূমিকা সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। উন্নত পারিবারিক শিক্ষায় সুসংগঠিত সমাজ গঠনের চাবিকাঠি। সুশিক্ষিত সমাজই প্রকৃত সুসংগঠিত সমাজ। যেখানকার প্রতিটি পরিবারের সদস্যরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত। এক্ষেত্রে তাই ভূমিকা ও দায়িত্বশীলতার স্থান থেকে একজন মা পরিবারের ও সমাজের প্রকৃত সংগঠক ও রূপকার। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর রয়েছে ভিন্নমূখী দায়িত্ব ও কর্তব্য। একজন আদর্শ নারীর সমস্ত জীবনই কঠোর সাধনায় পরিপূর্ণ। কন্যা, জায়া, জননী– এ ত্রিরূপে একজন নারী সমাজ জীবনে তার ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে থাকে। স্বীয় মেধা ও মনন, প্রতিভা ও যোগ্যতা এতদ্সঙ্গে ঈমান ও আকিদার দৃঢ়তার ভিত্তিতে প্রচেষ্টা ও সাধনা দিয়ে একজন নারী ইসলামি হুকুম-আহকাম দায়িত্বশীলতার সঙ্গে নিজ জীবনে যেমন পালন করতে পারে তেমনি এ বিষয়ে অপরকেও উৎসাহিত করতে পারে।

সময়ের প্রবহমাণতার জাহেলিয়া যুগের সমাজ জীবনের নানা প্রকার প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ সমাজ জীবনকে অধিকতর সহজ রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। সমাজে নানা প্রকার সমস্যা উত্তরণের ক্ষেত্রে ইসলামি শিক্ষা থেকে সহজতর সমাধান বের করার চেষ্টা করেছে। ফলে সমাজ ব্যবস্থায় যুক্ত হয়েছে প্রগতিশীলতার ধারা। ইসলাম সমাজে নারীর জীবনকে গতিশীল করেছে এবং তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। সমাজে নারীর অবস্থা উন্নয়নের মাপকাঠি।

আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বের আরব সমাজের তুলনায় বর্তমানে মানুষের জীবনযাত্রা অনেক সহজতর রূপ লাভ করেছে। পুরুষের পাশাপাশি সমাজে এখন নারীর জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত সহজ। ইসলাম নারীর জীবনে গতিশীলতা আনয়নে বিশাল ভূমিকা রেখেছে। ফলে সমাজে ইসলামি ঐতিহ্য রক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর দায়িত্বশীলতার পরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। সংসার জীবনের পাশাপাশি সমাজ জীবনেও তাকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপকতা বেড়ে গিয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী তাই ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে ইসলামি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে নারীর যথাযথ ভূমিকা পালন করা এখন অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পর থেকেই মুসলমানেরা বিভিন্ন প্রকার অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছেন। তাদের উপর নানা প্রকার জুলুম-নির্যাতন করে ইসলামের বিস্তার, প্রচার ও প্রসারে বাধা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি মহানবী (সা.)-কে নানা প্রকার অপবাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর পরিবার ও ইসলামের অনুসারীদের উপর কঠোর আঘাত হানা হয়েছে। সর্বোপরি মহানবী (সা.)-কে মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। তথাপি আল্লাহর রাসূল (সা.) এবং তাঁর পরিবার ও ইসলামের প্রকৃত অনুসারীরা

পিছু হটেননি। তাঁরা একমাত্র আল্লাহর উপর আস্থা রেখে ইসলামের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে ইসলামের সেবায় নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের সমগ্র জীবনই যুগে যুগে মুমিন মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

ইসলামের বিরুদ্ধে স্বার্থান্বেষী ও কুচক্রী ইহুদি ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের তৎপরতা এবং নানা কার্যকলাপ ও ইসলামবিরোধী অপপ্রচারে যখন চারপাশে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতময় প্রতিকূল পরিস্থিতি এমতাবস্থায় ইসলামি আদর্শের ভিত্তিকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে এর প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন যে মহিয়সী নারী তিনি খাতুনে জান্নাত হজরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.) বিনতে মুহাম্মাদ (সা.)। তিনি ছিলেন একাধারে নিবেদিত কন্যা, দায়িত্বশীল স্ত্রী, স্নেহময়ী মা, দুঃখী ও অভাবীদের সাহায্যকারী, ন্যায়পরায়ণ, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, পরহিতৈষী ও পরোপকারী, ধৈর্যশীল, সহনশীল, নারীর ইজ্জত ও সম্মানের প্রতীক পর্দার হেফাজতকারিণী, নারীদের মধ্যে ইসলামি মূল্যবোধ ও আদর্শ জাগ্রতকারী, অল্পে সন্তুষ্ট, আল্লাহর প্রতি গভীর ও পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপনকারী, ইসলামের প্রকৃত ও একনিষ্ঠ সেবাকারী, নিজের জীবনে শরিয়তের অনুশাসন পালনকারী এবং অন্যদের জীবনে তা বাস্তবায়নের শিক্ষা দানকারী। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আদরের দুলালি, নয়নের মনি হযরত ফাতিমা (সা.আ.)-এর মধ্যে বহুমুখী প্রতিভা, অন্যন্য ব্যক্তিত্ব এবং অসংখ্য গুণ ও যোগ্যতার সমন্বিত রূপ বিকাশ লাভ করেছিল। তিনি নারীকুলের অনুসরণীয় আদর্শ। তাঁর এ মহান আদর্শ অনুসরণকারীদের জন্য ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে যথাযথ ভূমিকা রাখা অসম্ভব কিছু নয়। এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত পর্যায়ে চেষ্টা এবং একনিষ্ঠ ও কঠোর সাধনা। নিজস্ব মেধা ও গুণাবলির যথার্থ বিকাশ ঘটানো এবং একই সাথে এ মহান মহীয়সী নারীর জীবনাদর্শকে অন্যতম আদর্শ হিসাবে নিজ জীবনে গ্রহণ করা ও সমাজে এর প্রতিফলন ঘটানো।

আহলে বাইতের এ মহীয়সী নারী জান্নাতের নারীদের নেত্রী। এ খাতুনে জান্নাতের চরিত্রে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ ছিল। তিনি বিভিন্ন গুণবাচক উপাধিতে স্মরণীয়। ইসলামি আদর্শের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক অনন্য মর্যাদার এ নারীর উপাধিসমূহ হলো- আয-যাহরা, আল-রাদিয়া, আল-মারদিয়া, আস-সিদ্দিকা, আল-তাহিরা, আয-যাকিয়া, আল মুবারাকা, আল্-বাতুল।

রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং ঘোষণা করেছেন, 'ফাতিমা হচ্ছে বিশ্বজগতের নারীকুলের নেত্রী (সাইয়্যেদাতু নিসায়ীল আলামীন)।' খাতুনে জান্নাত মহীয়সী এ নারী হযরত ফাতিমার জীবনের উপর আলোকপাত করা হলো-

নারী জাতির আদর্শ খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (সা.আ.) সাইয়্যেদুল কাওনাইন প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এবং উম্মুল মুমীনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা বিনতে খুওয়াইলীদের কন্যা। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াতের (আনুষ্ঠানিক ঘোষণা) প্রাপ্তির পর ৬১৫ (খ্রি.) ২০শে জামাদিউস্সানি রোজ শুক্রবার আরবের মরুভূমিতে আলোকবর্তিকা রূপে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পবিত্র ঘরে জন্মলাভ করেন।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর কন্যা ফাতিমা যাহরা (সা.আ.) ইসলামের সর্বোচ্চ আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তিনি বিশ্ববরেণ্য আদর্শ নারী, রমণীকুলের শিরোমণি। ইসলামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং ঐশী নির্দেশনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং একনিষ্ঠ ভক্তি এবং সেই নির্দেশনার আলোকে স্রষ্টার আদেশানুসারে জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তাঁর পূতঃপবিত্র জীবন সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে নারীকুলের জন্য সর্বোত্তম অনুসরণীয় আদর্শ।

নবী (সা.) তনয়া হযরত ফাতিমা (সা.আ.) শৈশব থেকেই ছিলেন পিতা-মাতার একান্ত অনুগত। অতি অল্প বয়সে মাতৃহারা ফাতিমা মায়ের সান্নিধ্যে অতিবাহিত সময়ের শিক্ষা ও আদর্শকে জীবনে শেষদিন পর্যন্ত ধারণ করেছিলেন। পিতার স্নেহময় ছায়ায় এবং প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। পিতার শিক্ষায় শিক্ষিত ফাতিমা (সা.আ.) এর সমস্ত জীবন ছিল ইসলামি ঐতিহ্য ও আদর্শের অনন্য প্রতিফলন।

'ফাতিমা' নামটি আরবি। অত্যন্ত পবিত্র সুন্দর এবং অর্থবহ। মহানবী (সা.) তাঁর প্রিয় কন্যার জন্য এ নামটি রেখেছিলেন। 'ফাতিমা' শব্দের অর্থ হলো 'বিরত থাকা, দূরে রাখা'। ফাতিমা (সা.আ.)-এর এই নামকরণের কারণ সম্পর্কে মহানবী (সা.) উল্লেখ করেছেন- 'ফাতিমা ও তার অনুসারীরা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত।' এ নামের মধ্য দিয়ে ফাতিমা (সা.আ.)-এর চারিত্রিক পবিত্রতা, নৈতিক শুদ্ধতা, আল্লাহর দয়ার প্রতি গভীর আস্থা এবং ইসলামের মহান আদর্শ ও নির্দেশনাকে তথা শরিয়তকে জীবন যাপনের অন্যতম পথ হিসেবে গ্রহণ করা এবং পরকালে জান্নাত লাভের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

আহলে বাইতের এ মহীয়সী নারী জান্নাতের নারীদের নেত্রী। এ খাতুনে জান্নাতের চরিত্রে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ ছিল। তিনি বিভিন্ন গুণবাচক উপাধিতে স্মরণীয়। ইসলামি আদর্শের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক অনন্য মর্যাদার এ নারীর উপাধিসমূহ হলো- আয-যাহরা, আল-রাদিয়া, আল-মারদিয়া, আস-সিদ্দিকা, আল-তাহিরা, আয-যাকিয়া, আল মুবারাকা, আল্-বাতুল। মহীয়সী এ নারী সম্পর্কে সৈয়দ জাফর সাহিদি উল্লেখ করেছেন-

She is the shining face of Muslim women, a shining light of knowledge and a clear exemplary model of piety and worship of Allah. This radiance is not

restricted to a particular hour and day. From the day she pledged her duty until today and forever, she shines like a gem in the darkness of Islamic education. [২]

পিতার সংস্পর্শে ফাতিমা (সা.আ.) বেড়ে ওঠায় প্রকৃত ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। স্নেহময় পিতা তাঁকে লালন পালন করেন এবং তাঁর শৈশব ও কৈশোর আল্লাহর প্রেরিত রাসূল (সা.)-এর ঘরে যেখানে ফেরেশতা ওহী নিয়ে এসেছেন এবং যা ছিল আল-কুরআন শিক্ষার কেন্দ্রস্থল সেখানে অতিবাহিত হয়। তাঁর ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সূত্রপাত এ ঘর থেকে এবং এ বিষয়ে তাঁকে হাতে খড়ি দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহর প্রেরিত রাসূল (সা.) যিনি সমগ্র বিশ্বের মানুষকে ইসলামের মহান আদর্শ ও ঐতিহ্যের শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। ঐশী ধর্ম ও জ্ঞানের মশালকে প্রজ্বলিত করে যিনি চির ভাস্বর হয়ে আছেন।

মা-হারা ফাতিমা (সা.আ.)-এর উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত ছিল। শৈশব থেকে তিনি তাঁর সমবয়সীদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতেন। পাড়া প্রতিবেশীদের যে কোনো প্রকার সমস্যায় সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতেন। তাঁদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। বাল্যকাল থেকে শান্ত প্রকৃতির ফাতিমা (সা.আ.) পিতার সান্নিধ্যে উপদেশমূলক ইসলামি শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হতেন এবং নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করতেন। তিনি ছিলেন দয়ার সাগর। মানুষের দুঃখ-কষ্টে বিচলিত হয়ে পড়তেন। সর্বোপরি মহান আল্লাহর কাছে বিপদ থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতেন। তিনি ছিলেন রাদিয়া (সন্তুষ্ট), মারদিয়া অর্থাৎ সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাহায্যের উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থাশীল। গভীর দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পতিত হলেও তিনি কখনই হতাশাগ্রস্ত হতেন না; বরং আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করতেন। তাঁর চরিত্রের এইসব মহান গুণ তাঁর কাজে ও ব্যবহারে প্রকাশ পেত। [৩]

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর কন্যা ফাতিমা ছিলেন পবিত্রাত্মা। কঠোর সাধনার মাধ্যমে পার্থিব জীবনের আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে তিনি ইসলামি মহান আদর্শকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি ছিলেন সাইয়্যেদা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা। হযরত ফাতিমা খাতুনে জান্নাত বেহেশতের রমণীকুলের সর্দার (সাইয়্যেদাতু নিসায়ি আহলিল জান্নাহ)। বাস্তব জীবনেও তিনি ছিলেন নির্ভীক, সত্যবাদী এবং অন্যায়ের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। মা খাদিজা তাঁকে একজন আদর্শ নারী হিসেবে জীবন গঠনের শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই যুগে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব না হলেও আদর্শ পিতা-মাতার সান্নিধ্যে যে পারিবারিক মহান শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। এ মহান আদর্শ নারীর মাঝে পার্থিব জীবনের লোভ-লালসা, আরাম-আয়েশ তথা বিলাসী জীবন যাপনের প্রতি কোনো লোভ জন্মায়নি। মহানবী (সা.) মা ফাতিমা (সা.আ.)-কে 'বাতুল' অর্থাৎ ইহজাগতিক ভোগলিপ্সা বর্জনকারিণী বলে ডেকেছেন। অভাব-অনটন-দুঃখ-কষ্টের মাঝেও তিনি সর্বদা খোদার রহমতের প্রতি গভীর আস্থাশীল এবং শোকর গোজার ছিলেন। সামান্যতে সন্তুষ্টি, বিপদে ধৈর্য ধারণ করা, অন্যায়ের প্রতিবাদ তাঁর জীবনের অনুকরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ছিল। আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া তাঁকে 'বাতুল' নামে ডাকার কারণ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন-

"Because she was incomparable in her chastity, virtues, religiousness, and lineage. It is also said that she was called so because she had devoted herself to Allah the Almighty and turned her back to the worldly life." [৪]

মহানবী (সা.)-এর মধ্যকার বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলি মা ফাতিমা (সা.আ.)-এর মধ্যে প্রতিভাত হয়েছিল। এ কারণে হযরত আয়েশা বলেছেন- 'হযরত ফাতিমা যাহরাকে দেখলে মনে হতো আমি নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে দেখছি। কেননা, তাঁর উত্তম চরিত্রের সকল মহৎ গুণই আমি ফাতিমার জীবনে দেখতে পেয়েছি।' [৫]

শৈশব থেকে ফাতিমা (সা.আ.)-এর মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিমগ্নতার বিষয়টি লক্ষ্যণীয় ছিল। একাকী থাকাকালীন তাঁর সমস্ত মনোযোগ, গভীর আধ্যাত্মিকতার দিকে পরিচালিত হতো। আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে তিনি শান্তি খুঁজে পেতেন।

তিনি ছিলেন 'উম্মে আবিহা' অর্থাৎ 'তার পিতার মা'। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর সুযোগ্য কন্যা হযরত ফাতিমা (সা.আ.)-এর মধ্যে দায়িত্বশীলতার বিশেষ গুণাবলি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পিতার

প্রতি কন্যার ছিল গভীর ভালোবাসা এবং অপরিসীম শ্রদ্ধা। মমতাময়ী মায়ের মৃত্যুর পর হযরত ফাতিমা তাঁর পিতার সেবা-যত্নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'উম্মে আবিহা' উপাধিটির মধ্যে পিতার প্রতি কন্যার ভালোবাসা, যত্ন ও সেবার বিষয়টির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এ উপাধি মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত। পরিপূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে তিনি পিতার প্রতি স্বীয় দায়িত্ব পালন করতেন। নবুওয়াত ঘোষণার প্রথম দিকে যখন মুশরিক, পৌত্তলিক, ইহুদি কর্তৃক মহানবী (সা.) বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন, এ সময় ফাতিমা ছায়ার মতো পিতাকে আগলে রাখতেন। কাবাগৃহে নামাজ পড়াকালীন সেজদারত অবস্থায় হযরত (সা.)-এর উপর কাফিররা উটের নাড়ি-ভুঁড়ি চাপিয়ে দিলে বালিকা ফাতিমা এ দৃশ্য দেখার সাথে সাথে ছুটে গিয়ে পিতার মাথার উপর থেকে আবর্জনা সরিয়ে দেন। উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) আহত হওয়ার সংবাদ শুনে ফাতিমা অন্যান্য নারীর সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে যান এবং মহানবীকে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলেন। খন্দকের যুদ্ধে নবী (সা.) পরিখা খননের সময় তিনদিন অনাহারে ছিলেন। ফাতিমা যাহরা তাঁর সন্তানদের জন্য যে সামান্য খাবার তৈরি করেছিলেন তা থেকে পিতার জন্য নিয়ে যান এবং তাঁকে খাওয়ান। নবীজী বলেন- 'তিনদিন পর এটাই আমার প্রথম খাবার যা তোমার থেকে তোমার পিতার নিকট এসে পৌঁছেছে।' এ ঘটনাসমূহ নিঃসন্দেহে পিতার প্রতি কন্যার গভীর ভালোবাসা এবং উভয়ের আত্মিক সম্পর্কের পরিচয় দান করে। মহানবী (সা.) যে কোনো অভিযানে যাওয়ার পূর্বে কন্যা ফাতিমার সঙ্গে দেখা করতেন আবার অভিযান থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে সালাত আদায় করে কন্যার সাথে দেখা করে তারপর স্বীয় বাড়িতে ফিরতেন। কন্যা ফাতিমার প্রতি পিতার স্নেহ এবং একই সাথে সম্মান প্রদর্শন ইতিহাসের অনন্য নজির। ফাতিমা মহানবীর সামনে উপস্থিত হলে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং খাতুনে জান্নাতের পবিত্র হস্ত মুবারক চুম্বন করতেন। সেই সাথে তাঁকে নিজ আসনে বসিয়ে দিতেন। এটি ছিল সমাজে মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কন্যা সন্তানদের সামাজিক মর্যাদা সমুন্নতকরণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

মহানবী (সা.)-এর মধ্যকার বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলি মা ফাতিমা (সা.আ.)-এর মধ্যে প্রতিভাত হয়েছিল। এ কারণে হযরত আয়েশা বলেছেন- 'হযরত ফাতিমা যাহরাকে দেখলে মনে হতো আমি নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে দেখছি। কেননা, তাঁর উত্তম চরিত্রের সকল মহৎ গুণই আমি ফাতিমার জীবনে দেখতে পেয়েছি।'

একজন বিশ্বস্ত ও কর্তব্যনিষ্ঠ এবং দায়িত্বশীল স্ত্রী হিসেবেও হযরত ফাতিমা যাহরার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সংসার পরিচালনা করে স্বামী হযরত আলী– শের-ই-খোদাকে সকল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতেন। যুদ্ধের সময় অথবা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কর্তৃক বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সূত্রে হযরত আলীর স্বীয় গৃহে অনুপস্থিত থাকাকালীন সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব হযরত ফাতিমা পালন করতেন। তাঁদের ঘর থেকে কোনো ভিক্ষুক খালি হাতে ফেরেনি। নিজেরা অভুক্ত থেকে ক্ষুধার্তকে খাবার দান করা তাঁদের অভ্যাস ছিল।

হযরত ফাতিমা যাহরা ছিলেন একজন আদর্শ স্নেহময়ী মা। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন। শৈশব থেকে সন্তানদের মধ্যে তিনি আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা এবং নবী (সা.)-কে অনুসরণের স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিলেন। তিনি সন্তানদেরকে ধর্মীয় অনুশাসনের শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর সন্তানেরা এ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ইসলামের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। ইসলামকে রক্ষা করার জন্য হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) কারবালার ময়দানে জীবন দিয়েছেন। মা ফাতিমা ছিলেন 'উম্মুল হাসনাইন' অর্থাৎ হযরত ইমাম হাসান (আ.) এবং ইমাম হোসাইন (আ.)-এর মা। তাঁর এই দুই সন্তান জান্নাতে যুবকদের সর্দার। কন্যা হযরত যায়নাব (সা.আ.) ইসলামী আদর্শে লালিত হয়েছিলেন। ঐশী জ্ঞান, নৈতিকতা, মানবতা, সাহসিকতা, বাগ্মিতা, বিচক্ষণতা, ধৈর্যশীলতা ইত্যাদি অসংখ্য গুণের তিনি অধিকারী ছিলেন। হযরত যায়নাব কারবালার যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হওয়ায় তিনি এ যুদ্ধ সম্পর্কে সমগ্র মুসলিম জাহানকে অবহিত করেছেন। তিনি অসুস্থ ইমাম হযরত যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর জীবন বাঁচিয়েছিলেন। 'পিতার অলংকার' হযরত যায়নাব হযরত আলীর আদর্শের উত্তরসূরি হয়ে ইসলামের ইতিহাসে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'যাহরায়ে ছানী' বা দ্বিতীয় যাহরা (সা.আ.)। তিনি তাঁর মায়ের মতোই সবদিক থেকে ছিলেন জ্যোতির্ময়। কুরাইশ গোত্রের নারীদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী হিসেবে 'আক্বিলাতুল কুরাইশ', 'আল-আলিমাহ', 'আস-সিদ্দিকা', 'আবিদাতুল আলে আলী' উপাধিও তিনি পেয়েছিলেন। ইসলামের দ্বীনি তালিম এর বিস্তারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

প্রকৃত ইসলামের শিক্ষায় সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার পাশাপাশি হযরত ফাতিমা (সা.আ.) মুসলমান নারীদের মধ্যেও ইসলামি শিক্ষার আলো প্রজ্বলিত করেছিলেন। মুসলিম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁর কাছ থেকে আল-কুরআন, হাদিস এবং মাসলা-মাসায়েল সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তিনি সুগভীর জ্ঞান, মেধা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসার যথার্থ উত্তর দিতেন।

হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.) পবিত্রতা ও পর্দাশীলতার অন্যতম প্রতীক। সকল মুসলিম নারীর জন্য পর্দাশীলতাকে ঈমানের অংশ এবং সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার উপায় হিসেবে তিনি দেখতেন।

পবিত্রতা ও পর্দাশীলতা নারীর সৌন্দর্য ও সম্মানকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পর্দা রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। তিনি নিজের জীবনেও এ বিষয়টির প্রাধান্য যেমন দিয়েছেন তেমনি মুসলিম নারীদেরকে পর্দা রক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে হিজাবসম্মত শালীন পোশাক পরিধানের নসিহত করেছেন। এক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের জন্য তিনি অনুসরণীয় আদর্শ। হযরত আবু নাঈম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- একবার রাসুল (সা.) সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করেন- 'নারীদের জন্য' সর্বোত্তম বিষয় কী? সাহাবিরা এর উত্তর জানতেন না। হযরত আলী এ বিষয়টি ফাতিমা যাহরাকে অবহিত করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উত্তরে বলেন: 'নারীদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় হচ্ছে তারা যেন অচেনা পুরুষদের না দেখে এবং কোনো অচেনা পুরুষও তাদেরকে না দেখে।'[৬] হযরত আলী রাসূল (সা.)-এর নিকট এ জবাবটি উপস্থাপন করলে রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করেন– 'এ

উত্তরটি তোমাকে কে বলেছে?' তিনি বলেন, 'ফাতিমা যাহরা।' রাসূল (সা.) বলেন, 'সে হচ্ছে আমার অস্তিত্বের অংশবিশেষ। যা কিছু তাকে অসন্তুষ্ট করে তা আমাকেও অসন্তুষ্ট করে এবং যা কিছু তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়।' [৭] আল-কুরআনের (৩৩: ৩২-৩৩ এবং ৩৩: ৫৯) আয়াতসমূহ এ বিষয় সম্পর্কিত।

ফাতিমা (সা.আ.) মহান আল্লাহর মনোনীত আদর্শ নারী। পুণ্যবতী, পূতঃপবিত্র চরিত্রের এ মহিয়সী নারীকে স্বয়ং আল্লাহ মনোনীত করেছেন। তিনি সমস্ত দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে। নিষ্পাপতা ও পবিত্রতা এবং গভীর আধ্যাত্মিকতা তাঁর মধ্যকার মৌলিক গুণ। যে চারজন নারী সমগ্র নারী জাতির মধ্যে সর্বোত্তম তাঁরা হলেন– মারইয়াম বিনতে ইমরান, আসিয়া বিনতে মোজাহেম, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ এবং ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ (সা.)। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)। [৮]

হযরত ফাতিমা আহলে বাইতের অন্যতম নারী সদস্য। তিনি রিসালাত ও ইমামতের মধ্যমণি। পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াত 'আয়াতে তাত্হীর' বা 'পবিত্রতার আয়াত' নামে পরিচিত। এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে– 'হে আহলে বাইত! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পূতঃপবিত্র রাখতে।' (৩৩:৩৩) এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আহলে বাইতের পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। [৯]

হাদিস আল-কিসা বা চাদরের হাদিসে আহলে বাইত সম্পর্কে জানা যায়। এ আয়াতটি তখন নাযিল হয় যখন মহানবী (সা.) তাঁর চাদরের নিচে হযরত আলী (রা.), হযরত ফাতিমা (সা.আ.), ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম হোসাইন (আ.)-কে ঢেকে দেন এবং বলেন, 'হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বাইত (পরিবার)। আমার নিকট আত্মীয়, অপবিত্রতা থেকে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পূতঃপবিত্র রাখো।'

আল-কুরআনের ৪২ নম্বর সূরার (সূরা আশ-শূরা) ২৩ নং আয়াতটি 'আয়াতে মাওয়াদ্দাহ' নামে পরিচিত। এ আয়াতে আল্লাহপাক প্রত্যেক মুসলমানের জন্য রাসূল (সা.) এবং তাঁর আহলে বাইতকে ভালোবাসা ফরজ করেছেন। আহলে বাইতের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ফাতিমা (সা.আ.) সম্পর্কে মহানবী (সা.) স্বয়ং বলেছেন– 'হে ফাতিমা, যে ব্যক্তি তোমার উপর দরুদ পড়বে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং বেহেশতের উত্তম স্থানে সে আমার সাথে যোগ দেবে।'[১০]

আহলে কিসার এ নিষ্পাপ ব্যক্তিদেরই মোবাহেলার মাঠে নবুওয়াতের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের চূড়ান্ত ফয়সালায় মহানবী (সা.) সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে নাজরানের খ্রিস্টান পাদ্রিরা যখন অস্বীকার করতে চাইলো তখন হযরত আলী (রা.), হযরত ফাতিমা (সা.আ), ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম হোসাইন (আ.)-কে সঙ্গে নিয়ে মহানবী (সা.) মোহাবিলার মাঠে গমন করেন এবং তাঁর নবুওয়াতি মিশনে ফাতিমাকে সত্যের মানদণ্ড অর্থাৎ নবুওয়াতের সত্যতার সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করেন। আল কুরআনের আয়াতে মোবাহিলার (৩:৬১) মাধ্যমে আহলে বাইতের সম্মান ও মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ পবিত্র মহড়ার মধ্য দিয়ে ফাতিমা (সা.আ.)-এর স্বতন্ত্র এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মূলত খাতামুন নবীয়্যীন পরবর্তী খোদায়ি মিশনের ধারাবাহিকতা যে ফাতিমা (সা.আ) ও তাঁর মাসুম সন্তানদের মধ্য দিয়ে অব্যাহত থাকবে, এর মাধ্যমে সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা, এরাই মহানবী (সা.)-এর আহলে বাইত (পরিবার) এবং ইসলামের মহাসত্যের প্রমাণ। এ কারণে মুমিন মুসলমানদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ফাতিমা ও আহলে

বাইতের প্রাপ্য অধিকার। আয়াতে মাওয়াদ্দাহ বা মহব্বতের আয়াতের (৪২:২৩) দ্বারা এটি প্রমাণিত।

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন, 'শাজারাতুত তাইয়্যেবা' বা পবিত্র গাছ হলেন রাসূলে খোদা (সা.), গাছের প্রধান শাখা হলেন ইমাম আলী, গাছের উপাদান হলেন ফাতিমা (সা.আ.), গাছের ফল হলেন ফাতিমার সন্তানগণ এবং গাছের পাতাসমূহ হলেন ফাতিমার সত্যিকার অনুসারীরা।' মুহাম্মাদ (সা.)-এর সন্তুষ্টি তাঁর আহলে বাইতের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ ভালোবাসার মধ্যে নিহিত। [১১] আহলে বাইতের আনুগত্য ও তাঁদের নেতৃত্বের স্বীকৃতি দুনিয়ায় অগ্রগতি এবং আখেরাতের মুক্তির একমাত্র পথ। সুতরাং এসব বিবেচনায় হযরত ফাতিমা (সা.আ.)-ই মুসলিম নারীদের অন্যতম আশ্রয়স্থল।

মা ফাতিমার সংক্ষিপ্ত জীবন ছিল ঘটনাবহুল। তিনি তাঁর পিতার খোদায়ি মিশনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসার কারণে। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা ও যোগ্যতা ছিল অতুলনীয়। শে'ব-ই-আবু তালিবে অবরুদ্ধ থাকাকালীন যে মানসিক চাপ পড়ে এ পরিবারের উপর সেই থেকে পরবর্তীকালে তিনি জীবনের কঠিনতম নানা সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে উঠেন।[১২] অতি অল্প বয়স থেকেই সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। গোত্রপতিরা যখন মহানবী (সা.)-কে হত্যার গোপন ষড়যন্ত্র করে মা ফাতিমা (সা.আ.) বিষয়টি অবহিত হলে কালক্ষেপণ না করে মহানবীকে তা জানান। [১৩]

সমাজ জীবনে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবেও মা ফাতিমার ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। জনকল্যাণমূলক কাজে তিনি ছিলেন অগ্রণী। এক্ষেত্রে তিনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে মুসলিম বাহিনীকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান, আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা, যুদ্ধক্ষেত্রে শহিদদের পরিবার পরিজনদের কাছে গিয়ে তাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান এবং সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে এতিম, অভাবী ও দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করেছেন। অভাবী ও দরিদ্রদের জন্য তাঁর ঘরের দরজা সব সময় উন্মুক্ত থাকত। সমাজসেবা ব্যবস্থাপনায় তাঁর ছিল বিশেষ দক্ষতা। খাইবার যুদ্ধের পর রাসূলে খোদা (সা.) হযরত ফাতিমাকে বাগানসমৃদ্ধ 'ফাদাক' ভূখণ্ড প্রদান করেন আল্লাহর নির্দেশে। সে বাগানের আয়ের সমুদয় অর্থ মা ফাতিমা দরিদ্র, অনাথ, দুর্দশাগ্রস্ত, শহিদদের বিধবা স্ত্রী ও অভাবীদের সাহায্যার্থে ব্যয় করেছেন। হযরত ফাতিমার সামাজিক দায়িত্ববোধ মানুষকে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি যখন আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন তখন অন্যদেরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দিতেন। রাত জেগে নফল ইবাদত করতেন এবং অভাবী লোকদের ও প্রতিবেশীদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে আবেদন-নিবেদন করতেন। সামাজিক দায়িত্বানুভূতির ক্ষেত্রে এ ধরনের চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন মানুষ ইতিহাসে বিরল।

হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর বাগ্মিতা, অধিকার সচেতনতা, সাহসিকতা এবং সামাজিক সচেতনতা উল্লেখযোগ্য। তাঁর বক্তৃতা, কবিতা ও বাণীসমূহ তাঁর বুদ্ধিভিত্তিক যোগ্যতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও উদারতার স্বাক্ষর বহন করে। তিনি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার সপক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওফাতের পর তিনি মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শকে স্মরণ করিয়ে প্রথম খুৎবা দেন। দ্বিতীয় খুতবা অসুস্থ থাকা অবস্থায় নিজ আবাসস্থলে আনসার ও মুহাজির নারীদের সামনে দেন। ইসলামের হেফাজত ও রক্ষায় তাঁর প্রদত্ত খুতবার নির্দেশাবলি যুগে যুগে স্মরণীয়।

মা ফাতিমাকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করে বিশ্বের নারী জাতির 'রোল মডেল' হিসেবে অনুসরণকারী দেশ ইরানের ভূমিকা এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে যার অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় তিনি ইরানের ইসলামি বিপ্লবের নেতা হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.)। বিংশ শতাব্দীর এ বিপ্লবের মাধ্যমে ইরানি নারিগণের ইসলামি মূল্যবোধ, শালীনতা ও মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নারীর সগৌরব উপস্থিতির এক নতুন প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে।

ইরানের ইসলামি বিপ্লবের মহান নেতা হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.) ও তাঁর উত্তরসূরি ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হযরত সাইয়্যেদ আলী হোসাইনী খামেনেয়ী তাঁদের বিভিন্ন ভাষণ ও বাণীতে মহিয়সী নারী খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-কে মানবজাতির ইতিহাসে নারীকুলের সর্বোত্তম অনুসরণীয় আদর্শ ও শ্রেষ্ঠতম নারী উল্লেখ করে তাঁর জীবনের বিভিন্ন শিক্ষণীয় দিক তুলে ধরেছেন। হযরত ফাতিমার মর্যাদাকে পৃথিবীর বুকে তুলে ধরার জন্য তাঁর পবিত্র জন্ম দিবস ২০শে জমাদিউস্‌সানিকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের 'নারী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছেন হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.)। এ দিবসটি ইরানে সরকারিভাবে মর্যাদা সহকারে পালিত হয়ে আসছে। মা ফাতিমার অনুসারীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ দিবসটি পালনের বিষয়ে তৎপর রয়েছে।

মা ফাতিমাকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করে বিশ্বের নারী জাতির 'রোল মডেল' হিসেবে অনুসরণকারী দেশ ইরানের ভূমিকা এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে যার অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় তিনি ইরানের ইসলামি বিপ্লবের নেতা হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.)। বিংশ শতাব্দীর এ বিপ্লবের মাধ্যমে ইরানি নারিগণের ইসলামি মূল্যবোধ, শালীনতা ও মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নারীর সগৌরব উপস্থিতির এক নতুন প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে। সম্পদ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষার পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ইরানি নারীরা অংশগ্রহণ করছে। শালীনতা ও হিজাব রক্ষা করে

তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। ইরানি নারীরা তাঁদের যুদ্ধোদ্যোগ ইউনিটসমূহ চালু রেখেছে। তারা ইসলামি রাষ্ট্রের পুনঃগঠনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও গবেষণা, খেলাধুলা ও রাজনৈতিক অঙ্গনসহ কার্যনির্বাহী ও প্রাইভেট সেক্টরে প্রতিনিধিত্ব এমনকি বিচার ব্যবস্থায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের সচেতনতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। হযরত ফাতিমা (সা.আ.)-এর অনুসারী নারীদের ইসলামি বিপ্লবের পরে সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন, সম্মান, মর্যাদা ও সাফল্যের বিষয়টি পাশ্চাত্যের মনোজগতে বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এমতাবস্থায় এ মহিয়সী নারী খাতুনে জান্নাতের আদর্শকে জীবনের অন্যতম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা, তাঁর নেক আমল, পূতঃপবিত্র ও নিষ্পাপ চরিত্র এবং তাঁর প্রদত্ত জ্ঞান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা অপরিহার্য। একমাত্র তাঁর প্রদর্শিত পথ ও জীবনাদর্শকে অনুসরণের মাধ্যমে ইহকালের শান্তি ও পরকালে মুক্তি বা নাজাত পাওয়া যেতে পারে। কেননা, তিনি একাধারে 'সাইয়্যেদাতু নিসায়িল আলামীন' এবং 'সাইয়্যেদাতু নিসায়ি আহলিল জান্নাহ'।

আলোকিত এ মহান নারীর জীবন সম্পর্কে আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা, স্কুল-কলেজ পর্যায়ে তাঁর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে পাঠ্য বইয়ে অধ্যায় সংযোজন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিএ অনার্স ও মাস্টার্সের সিলেবাসে তাঁর জীবন ও বহুমুখী কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি, এমফিল ও পিএইচডির ক্ষেত্রে তাঁর বিষয়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা, মা ফাতিমা সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ একান্ত বাঞ্ছনীয় ও কাম্য– যা পরবর্তী প্রজন্মকে জ্ঞান দান করবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সংগঠন, ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় পর্যায়ে এ মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের এটি অন্যতম ধর্মীয় ও ঈমানি দায়িত্ব বলে আমি মনে করি।

সূত্র

১. সূরা নাহল, ১৬ : ৫৮।

২. The life of Fatima Zahra, Syed Jafar Sahidi, Eng.Tr. by Abdul Qadir Muhammad Bello, compiled by Mohammad Reza Javadi, p.18

৩. সিরাতে ফাতেমা তুজ জোহরা, সংকলক মো. বিলাল কাদেরী, প্রকাশক সাব্বির ব্রাদার্স, উর্দু বাজার, লাহোর, প্রকাশকাল ২০০০।

৪. Lisan Al Arab, Vol-16, p.43

৫. বেহেস্তের নারীদের সর্দার রাসূল (সা.)-এর দুলালী হযরত ফাতিমা (সা.)-এর জীবনী, মাওলানা রফিকুল ইসলাম, ইনসাফ পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, নভেম্বর ২০১৯, পৃ. ১২৭।

৬. মুনতাহাল আমাল।

৭. তিরমিজি শরীফ।

৮. যাখায়েরুল উকবাহ, পৃ. ৪৪।

৯. মহানবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইত, সংকলক মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, পৃ. ৫৪।

১০. কাশফুল গুম্মাহ, পৃ. ২৩০।

১১. বুখারী শরীফ, হাদিস নং-৩৪৪৭।

১২. যিয়ারতে ফাতিমা, মাফাতিহুল জিনান।

১৩. মানাকিব ইবনে শাহার আসহাব খণ্ড-১, পৃ. ৭১, বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড-১৮, পৃ. ৬০।

লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহররম, আশুরা ও ইমাম হুসাইন (আ.)-এর স্মরণে কয়েকটি হাদিস

মুহররম শোকের মাস

ইমাম রেযা (আ.) বলেছেন : মুহররম মাসের আগমনের সাথে সাথে আমার পিতা ইমাম কাযিম (আ.)-কে কখনও হাসতে দেখা যেত না; মাসের (প্রথম) দশ দিন তাকে বিষণ্নতা এবং দুঃখ গ্রাস করত; আর যখন মাসের দশম দিন ভোর হতো, তখন এটি তার জন্য দুঃখ, শোক এবং কান্নার দিন হতো।– আমালি সাদুক, পৃষ্ঠা ১১১

আশুরা শোকের দিন

ইমাম রেযা (আ.) বলেছেন : যার জন্য আশুরার দিনটি দুঃখ, শোক এবং কান্নার দিন হবে, পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহ কিয়ামতের দিনটিকে তার জন্য খুশী ও আনন্দের দিন করে দেবেন।– বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৪৪, পৃষ্ঠা ২৮৪

হুসাইনি প্রেমের উত্তাপ

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : অবশ্যই হুসাইনের হত্যাকাণ্ডে মুমিনদের অন্তরে এমন একটি উত্তাপ বিদ্যমান যা কখনও প্রশমিত হয় না।– মুসতাদরাকুল ওয়াসাইল, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৩১৮

হাসিমুখ

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : হে ফাতিমা! কিয়ামতের দিন প্রতিটি চোখ কাঁদবে, কেবল সেই চোখ ছাড়া যে চোখ হুসাইনের শোকে অশ্রুপাত করেছে। অবশ্যই সেই চোখ হাসবে এবং তাকে জান্নাতের নেয়ামত ও আরামের সুসংবাদ দেওয়া হবে।– বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৪৪ পৃষ্ঠা ১৯৩

শহিদ সঙ্গীদের সমতুল্য প্রতিদান মোফা আসু

ইমাম রেযা (আ.) তাঁর এক সঙ্গীকে বলেন : যদি তুমি চাও যে, তোমার জন্য হুসাইন (আ.)-এর সাথে শহিদদের সমতুল্য প্রতিদান হোক, তাহলে যখনই তাঁকে স্মরণ করবে তখন বলবে : 'হায়! আমি যদি তাঁদের সাথে থাকতাম! আমি একটি মহান সফলতা অর্জন করতাম'।– ওয়াসাইলুশ শিয়া, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৫০১

শোকগাথা

আবু হারুন আল মাকফুফ বলেন : আমি ইমাম সাদিক (আ.)-এর সামনে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বললেন : 'আমার জন্য একটি কবিতা আবৃত্তি করো' এবং আমি তাঁর জন্য আবৃত্তি করলাম। তিনি বললেন, 'এভাবে না। তুমি যেমনভাবে হুসাইন (আ.)-এর কবরের সামনে কবিতা ও শোকগাথা পাঠ করো সেভাবে আমার জন্য পাঠ করো' এবং আমি তাঁর জন্য (আবার) পাঠ করলাম।– বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৪৪, পৃষ্ঠা ২৮৭

হুসাইন (আ.)-এর জন্য কবিতা বা শোকগাথা পাঠের সওয়াব

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : যে ব্যক্তি হুসাইন (আ.)-এর জন্য কবিতা পাঠ করে এবং নিজে কাঁদে এবং অন্যদের কাঁদায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করেন এবং তার পাপ ক্ষমা করে দেন।– রিজাল, শাইখ আল তুসী, পৃষ্ঠা ১৮৯

শোকগাথা পাঠকারী

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মানুষের মধ্যে এমন লোকদেরকে স্থান দিয়েছেন যারা আমাদের কাছে আসে এবং আমাদের সম্পর্কে শোকগাথা পাঠ করে।– ওয়াসাইলুশ শিয়া, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৪৬৯

শোকের সময় কবিতা পাঠ

ইমাম রেযা (আ.) আহলে বাইতের প্রতি আন্তরিকভাবে নিবেদিতপ্রাণ দেবিলকে বললেন: আমি চাই তুমি আমার জন্য কবিতা পাঠ করো, কারণ, নিঃসন্দেহে এই দিনগুলো (মুহররম মাসের) শোক ও দুঃখের দিন, যা আমাদের– আহলে বাইতের উপর দিয়ে গেছে।– মুসতাদরাকুল ওয়াসাইল, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৩৮৬

অনুসারী

ইমাম আলী (আ.) বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের জন্য এমন অনুসারীদের মনোনীত করেছেন, যারা আমাদেরকে সাহায্য করে এবং আমাদের আনন্দে আনন্দিত হয় এবং আমাদের দুঃখে দুঃখিত হয়।– গুরারুল হিকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৫

জান্নাত– শোকের প্রতিদান

ইমাম আলী ইবনে হুসাইন (আ.) বলতেন : প্রত্যেক মুমিন যার চোখ হুসাইন ইবনে আলী (আ.) এবং তাঁর সাথিদের হত্যার কারণে এমনভাবে অশ্রু ঝরায় যে, তার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে

পড়ে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের উঁচু জায়গায় স্থান দেবেন।– ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দাহ, পৃষ্ঠা ৪১৯

ফাতিমা (আ.)-এর সন্তানদের স্মরণ

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) বলেছেন : অবশ্যই আমি কখনই ফাতিমা (আ.)-এর সন্তানদের শাহাদাতের কথা স্মরণ করিনি, যখন আমি এর কারণে অশ্রুতে না ভিজে গেছি।– বিহারুল আনওয়ার খণ্ড ৪৬, পৃষ্ঠা ১০৯।

বাড়িতে শোক পালন

আশুরার দিনে যারা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর যিয়ারাত করতে যেতে অক্ষম, তাদের জন্য ইমাম বাকির (আ.) আযাদারি করার পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন এভাবে : তার উচিত হুসাইন (আ.)-এর জন্য শোক করা, তাঁর জন্য ক্রন্দন করা এবং বাড়ির সদস্যদেরকে তাঁর জন্য কাঁদতে নির্দেশ দেওয়া। তার উচিত তাঁর জন্য বিলাপ ও শোক প্রকাশ করার জন্য বাড়িতেই শোক অনুষ্ঠান আয়োজন করা; লোকেরা তাদের ঘরে একে অপরের সাথে দেখা করবে এবং তাঁর উপর আপতিত মুসিবতের জন্য একে অপরকে সমবেদনা জানাবে ও সান্ত্বনা দেবে।– কামিলুয যিয়ারাত, পৃষ্ঠা ১৭৫

কারবালার শহিদদের শোকে আলী (আ.)-এর কান্না

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) তাঁর দুই সঙ্গীর সাথে যখন কারবালার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি (তাঁদেরকে) বললেন, 'এটা তাদের পশুদের বিশ্রামস্থল এবং এখানেই তাদের জিনিসপত্র রাখা হবে; এবং এখানেই তাদের রক্তপাত করা হবে।...'– বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৯৮, পৃষ্ঠা ২৫৮

অশ্রু– জাহান্নামের অন্তরায়

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : যে আমাদেরকে স্মরণ করে, অথবা যার উপস্থিতিতে আমাদের স্মরণ করা হয়, এবং (ফলস্বরূপ) তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়, যদিও তা মশার ডানার পরিমাণও হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন এবং অশ্রু তার ও (জাহান্নামের) আগুনের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।– আল গাদীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২০২

বিশ বছরের কান্না!

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : (কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার পর) আলী ইবনে হুসাইন (আ.) বিশ বছর ধরে হুসাইন (আ.)-এর জন্য কাঁদতেন; তাঁর সামনে কোনো খাবার রাখা হলেই তিনি কাঁদতে শুরু করতেন।– বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৪৬, পৃষ্ঠা ১০৮

শোকের আদব

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : যখন মহানবী (সা.)-এর পুত্র ইবরাহিম (আ.)-এর মৃত্যু হয় তখন তাঁর চোখ অশ্রুতে ভরে যায়। তিনি বলেন, 'চোখ অশ্রুসিক্ত এবং হৃদয় ব্যথিত, (কিন্তু) আমরা এমন কিছু বলব না যা প্রভুকে রাগান্বিত করে। অবশ্যই আমরা, হে ইবরাহিম, তোমার জন্য শোকাহত।'– বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা ১৫৭

হুসাইনি সমাবেশ

ইমাম সাদিক (আ.) ফুযাইলকে বললেন : তোমরা কি একসাথে বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো? ফুযাইল উত্তর দিলেন : জী, হ্যাঁ। ইমাম তখন বললেন : আমি এই বৈঠকগুলোকে অনুমোদন করি। অতএব, আমাদের 'বিষয়' (ইমামাত)-কে জীবিত রাখো। যারা আমাদের বিষয় এবং মিশনকে পুনরুজ্জীবিত করে তাদের উপর আল্লাহ রহম করুন!– ওয়াসাইলুশ শিয়া, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৩৯১।

> **রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : হে ফাতিমা! কিয়ামতের দিন প্রতিটি চোখ কাঁদবে, কেবল সেই চোখ ছাড়া যে চোখ হুসাইনের শোকে অশ্রুপাত করেছে। অবশ্যই সেই চোখ হাসবে এবং তাকে জান্নাতের নেয়ামত ও আরামের সুসংবাদ দেওয়া হবে।**

অমূল্য অশ্রু

ইমাম সাদিক (ইমাম হুসাইনের জন্য শোক প্রকাশকারীদের একজন) মাসমা'কে বললেন : আল্লাহ তোমার চোখের জলের উপর রহম করুন! জেনে রেখো যে, তোমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করা হয় যারা আমাদের জন্য গভীরভাবে চিন্তিত এবং যারা আমাদের আনন্দে আনন্দিত এবং আমাদের দুঃখে শোকাহত। জেনে রেখো যে, তুমি তোমার মৃত্যুর সময় আমার পিতৃপুরুষদেরকে তোমার কাছে উপস্থিত দেখতে পাবে।– ওয়াসাইল, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৩৯৭

দগ্ধ হৃদয়

ইমাম সাদিক (নামাযের জায়গায় বসে শোকাহতদের এবং আহলে বাইতের যিয়ারাতে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন) : হে প্রভু, আমাদের জন্য সহানুভূতিশীল হয়ে অশ্রু ঝরিয়েছে এমন চোখগুলোর উপর রহম করুন; আমাদের জন্য পেরেশান ও দগ্ধ হয়েছে এমন হৃদয়গুলোর উপর রহম করুন; এবং আমাদের জন্য করা ক্রন্দনগুলোর উপর (রহম করুন)।– বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৯৮, পৃষ্ঠা ৮

আকাশের কান্না

ইমাম সাদিক (আ.) বললেন : হে জুরারাহ! হুসাইন (আ.)-এর (শাহাদাতের) জন্য আকাশ চল্লিশ দিন ধরে কেঁদেছিল।– মুস্তাদরাকুল ওয়াসাইল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯১।

নবী (সা.) এবং শহিদদের জন্য কান্না

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : জাফর ইবনে আবি তালিব (আ.) এবং যায়েদ ইবনে হারিসার শাহাদাতের সংবাদ মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছানোর পর, যখনই তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন তখন

তিনি তাঁদের জন্য অঝোরে কাঁদতেন এবং বলতেন : 'তারা আমার সাথে কথা বলত, তারা আমার ঘনিষ্ঠ ছিল এবং (এখন) তারা উভয়েই একসাথে চলে গেছে (শহিদ হয়েছে)।'– মান লা ইয়াহদুরুহুল ফাকিহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৭।

আহলে বাইতের প্রতি সহানুভূতি

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : আমাদের উপর অন্যায়-অত্যাচারের কারণে যে দুঃখিত হয় তার নিঃশ্বাস তাসবীহ (আল্লাহর প্রশংসা) এবং আমাদের জন্য তার শোক ইবাদত (আল্লাহর ইবাদত) এবং আমাদের গোপনীয়তা গোপন রাখা আল্লাহর পথে জিহাদ।

ইমাম (আ.) এরপর আরও বলেন: এই হাদিসটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত।– আমালি, শেইখ আল মুফিদ, পৃষ্ঠা ৩৩৮।

শোকগ্রস্ত ফেরেশতাগণ

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : আল্লাহ ইমাম হুসাইন (আ.)-এর কবরে চার হাজার ব্যথিত ও শোকাহত ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন, যাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর জন্য কাঁদবেন।– কামিলুয যিয়ারাত, পৃষ্ঠা ১১৯।

হুসাইন (আ.)-এর জন্য কান্না

(রাইয়ান ইবনে শাবিবকে) ইমাম রেযা (আ.) বললেন : হে শাবিবের পুত্র! যদি তোমার কোনো কিছুর জন্য কাঁদতে হয়, তাহলে হুসাইন ইবনে আলী (আ.)-এর জন্য কাঁদো। কারণ, তাঁকে এমনভাবে জবাই করা হয়েছে যেভাবে একটি ভেড়াকে জবাই করা হয়।– বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৯৪, পৃষ্ঠা ২৮৬।

ইমামদের স্মরণে সমাবেশ

ইমাম রেযা (আ.) বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন এক সমাবেশে বসে যেখানে আমাদের বিষয়গুলো (এবং আমাদের পথ ও লক্ষ্য) নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং পুনরুজ্জীবিত করা হয়, তার হৃদয় সেই দিন (কিয়ামতের দিন) মারা যাবে না যখন হৃদয়গুলো (ভয়ে) মারা যাবে।– বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৭৮।

হুসাইন (আ.)-এর জন্য কান্নার উপকারিতা

ইমাম রেযা (আ.) বলেছেন : যদি তোমরা কোনো কিছুর জন্য (কারো জন্য) কাঁদতে চাও তাহলে হুসাইন (আ.)-এর জন্য কাঁদো, কারণ, নিশ্চিতভাবেই, তাঁর জন্য কাঁদলে তার বড় পাপও মুছে যায়।– বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৯৪, পৃষ্ঠা ১৮৪।

পাপের ক্ষমা

ইমাম রেযা (আ.) বলেন : হে শাবিবের পুত্র! যদি তুমি হুসাইন (আ.)-এর জন্য এত পরিমাণে কাঁদো যে, তোমার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, তাহলে আল্লাহ তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন... – আমালি, শেইখ সাদুক, পৃষ্ঠা ১১১।

(মহানবীর) বংশধরদের সাথে ঘনিষ্ঠতা

ইমাম রেযা (আ.) ইবনে শাবিবকে বলেন : হে শাবিবের পুত্র! যদি তুমি আমাদের সাথে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদায় অবস্থান করায় আনন্দিত হও (এবং তুমি তা চাও), তাহলে আমাদের দুঃখে দুঃখিত হও এবং আমাদের সুখে খুশি হও।– ওয়াসাইলুশ শিয়া, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৫০২।

আশুরার দিন

ইমাম রেযা (আ.) বলেছেন : যে ব্যক্তি আশুরার দিনে তার (পার্থিব) কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখেরাতের কামনা-বাসনাকে পূরণ করবেন।– ওয়াসাইলুশ শিয়া, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৫০৪

হুসাইন (আ.)-এর যিয়ারাত

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : ইমাম হুসাইন (আ.)-এর যিয়ারাতকারী (তাঁর যিয়ারাত থেকে) এমনভাবে ফিরে যায় যে, তার একটি পাপও অবশিষ্ট থাকে না।– প্রাগুক্ত, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৪১২

যিয়ারাতকারীর জন্য হুসাইন (আ.)-এর ক্ষমা প্রার্থনা

(ইমাম হুসাইনের মাজার যিয়ারত করতে যাওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে) ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : যে ব্যক্তি ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জন্য কাঁদে, অবশ্যই ইমাম (আ.) তাকে দেখেন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁর পবিত্র পিতৃপুরুষদের কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুরোধ করেন।– বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৪৪, পৃষ্ঠা ১৮১

কিয়ামতের দিন সুপারিশ

রাসূলুল্লাহ (সা.) (ফাতিমা সাল্লামুল্লাহ আলাইহাকে বলেছিলেন): কিয়ামতের দিন তুমি নারীদের জন্য সুপারিশ করবে এবং আমি পুরুষদের জন্য সুপারিশ করব; যে ব্যক্তি হুসাইনের বিয়োগান্ত ঘটনায় কাঁদে, আমরা তাকে হাত ধরে জান্নাতে নিয়ে যাব।– বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৯৪, পৃষ্ঠা ১৯২

আশুরার দিনে ইমাম সাদিক (আ.)

আবদুল্লাহ ইবনে সিনান বলেন : আমি আশুরার দিনে আমার মাওলা ইমাম সাদিক (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ফ্যাকাশে ও শোকে কাতর অবস্থায় দেখতে পেলাম, তাঁর চোখ থেকে মুক্তার মতো অশ্রু ঝরছিল।– মুস্তাদরাকুল ওয়াসাইল, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৭৯

ফেরেশতারা নন, নবীরাও নন

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : কিয়ামতের দিন একটি দলকে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও সম্মানিত অবস্থায় দেখা যাবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তারা কি ফেরেশতাদের দল নাকি নবীদের দল। উত্তরে তারা বলবে : 'আমরা ফেরেশতাও নই, নবীও নই; বরং মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মতের দরিদ্রদের একটি দল।' তারপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে : 'তাহলে তোমরা কীভাবে এই উচ্চ ও সম্মানিত মর্যাদা অর্জন করেছ?' তারা বলবে : 'আমরা খুব বেশি নেক আমল করতাম না, প্রতিদিন রোজা রাখতাম না, সারা রাত ইবাদতে কাটাতাম না, তবে হ্যাঁ, আমরা নিয়মিত নামাজ পড়তাম এবং যখনই আমরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর নাম শুনতাম, তখন আমাদের গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত।'– মুস্তাদরাকুল ওয়াসাইল, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৩১৮

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মাজার যিয়ারাত

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : তিনি (ইমাম হুসাইন) তাদেরকে দেখেন যারা তাঁর মাজারে আসে এবং তিনি তাদের নাম, তাদের পিতার নাম এবং সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে তোমরা নিজ সন্তানদের সম্পর্কে যা জান তার চেয়েও ভালোভাবে জানেন!– ওয়াসাইলুশ শিয়া, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৪১১

কান্নারত ঈসা (আ.)

ইবনে আব্বাসকে ইমাম আলী (আ.) বললেন : (একবার কারবালার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়) ঈসা (আ.) বসে পড়লেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর শিষ্যরা যারা তাঁকে দেখছিল, তারাও তাঁকে অনুসরণ করল এবং কাঁদতে শুরু করল, কিন্তু এই আচরণের কারণ বুঝতে না পেরে তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল : 'হে রুহুল্লাহ! আপনার কান্নার কারণ কী?' ঈসা (আ.) বললেন : 'তোমরা কি জান এটা কোন্ ভূমি?' শিষ্যরা উত্তর দিল : 'না।' তারপর তিনি বললেন : 'এটি সেই ভূমি যেখানে নবী আহমাদ (সা.)-এর সন্তানকে (বংশধরকে) হত্যা করা হবে।'– বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৪৪, পৃষ্ঠা ২৫২

সকল প্রাণীর ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জন্য ক্রন্দন

আবু বাসীর বর্ণনা করেন যে, ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন : মানুষ, জিন, পাখি এবং বন্য পশুরা (সকলেই) হুসাইন ইবনে আলী (আ.)-এর (উপর বিপর্যয়কর ঘটনার) কারণে শোক প্রকাশ করেছিল এবং কেঁদেছিল।– কামিলুয যিয়ারাত, পৃষ্ঠা ৭৯

সূত্র : ইন্টারনেট

অনুবাদ : মোঃ আশিফুর রহমান

মুবাহিলার আধ্যাত্মিক দর্শন: আহলে বাইত (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন ও ইসলামের চিরন্তন বিজয়

মীর আশরাফ-উল-আলম

ভূমিকা

ইতিহাসের অমর গদ্যপট যেন সুদূর অতীত থেকে আমাদের কানে একটি বার্তা পৌঁছে দেয়– সত্য সর্বদা বিজয়ী। সময়ের আবর্তে ক্ষমতার হাতবদল হয়, সভ্যতা দুলে ওঠে, কিন্তু সত্যের তর্ক যেখানে একবার মীমাংসিত হয়, তা যুগের পর যুগ মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে। ইতিহাসের পাতায় এমন কিছু ঘটনা অম্লান স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ, যা কেবল একটি জাতির নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক গতিপথ নির্ধারণ করেছে।

তেমনই এক প্রামাণ্য, উজ্জ্বল ও অলৌকিক ঘটনা হলো মুবাহিলা, যা মানবসমাজকে দেখিয়েছিল, কিভাবে মহান আল্লাহ নিজেই আসমান থেকে সত্য-মিথ্যার ফয়সালা করে দেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরান-এর ৬১ নং আয়াত এই ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে।

মুবাহিলা, ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা যা ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে (১০ম হিজরি) সংঘটিত হয়েছিল। এটি কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরং এর গভীর আধ্যাত্মিক দর্শন রয়েছে যা আহলে বাইত (আ.)-এর উচ্চ মর্যাদা এবং ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। এই ঘটনা শিয়া ও সুন্নি উভয় ধারার মুসলিমদের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উভয় সূত্রেই এর বিশদ বিবরণ ও তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে, যা কুরআনে সূরা আলে ইমরান-এর ৬১ নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে।

আরো গভীরভাবে দেখলে দেখা যায়, মুবাহিলা কেবল একটি বহিরঙ্গ ঘটনার নয়, বরং এই আয়াতের তাৎপর্য ও ঘটনাপ্রবাহ একদিকে যেমন আহলে বাইত (আ.)-এর অতুলনীয় মর্যাদা, পবিত্রতা, নৈতিক শুদ্ধতা ও শাশ্বত সত্যের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের চূড়ান্ত ও চিরন্তন প্রকাশ, তেমনি অন্যদিকে, ইসলামের বিজয়, সত্যের জয় ও বাতিলের পরাজয়কেও সুদৃঢ়রূপে ঘোষণা করেছে। ইসলামের বিজয় ও আল্লাহর সাহায্যের এক বিস্ময়কর বাস্তব উদাহরণও বটে।

এটি নবী মুহাম্মদ (সা.) এবং নাজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলের মধ্যে সংঘটিত মুবাহালার (পারস্পরিক অভিশাপ) ঘটনাকে নির্দেশ করে।

মুবাহালা কী?

'মুবাহালা' শব্দটি আরবি 'বাহালা' মূল থেকে এসেছে, যার অর্থ 'পরস্পরের প্রতি অভিশাপ দেওয়া' বা 'মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর লানত (অভিশাপ) কামনা করা'। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে দুটি পক্ষ, যারা কোনো বিষয়ে মতভেদ বা বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে, তারা উভয়েই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে, যে মিথ্যাবাদী তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক এবং তাকে ধ্বংস করে দেওয়া হোক।

এটি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসার একটি পদ্ধতি, যেখানে যুক্তিতর্কের বাইরে গিয়ে ঐশী হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন করা হয়। এটি চরম সত্য প্রতিষ্ঠার এক ঐশী প্রক্রিয়া।

ইবনে মানযুর তাঁর বিখ্যাত আরবি অভিধান লিসানুল আরাব-এ বলেন:

البَهْلُ: التَّخْلِيَةُ وَالتَّسْلِيطُ، وَيُقَالُ: ابْتَهَلَ القَوْمُ إِلَى اللهِ: تَحَاجُّوا وَجَعَلُوا اللَّعْنَةَ عَلَى الكَاذِبِ مِنْهُمْ.

'আল-বাহল' (البَهْلُ) অর্থ পরিত্যাগ করা (তাকদীরে সোপর্দ করা) এবং কর্তৃত্ব দান করা। বলা হয়: 'একটি সম্প্রদায় মুবাহিলার জন্য আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি রুজু করল। অর্থাৎ তারা পরস্পর তর্কে লিপ্ত হলো এবং নিজেদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, তার উপর আল্লাহর লানত কামনা করল।

'মুবাহিলা হলো আল্লাহর প্রতি এমন দুআ করা, যেখানে দুই পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে অভিশাপ দেয় এবং আল্লাহর কাছে

ফয়সালার আবেদন করে।' লিসানুল আরাব, বাহল অধ্যায়।

আয়াতে মুবাহিলার পাঠ ও প্রাথমিক প্রেক্ষাপট

১- পবিত্র কুরআনের আয়াত

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

"তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে ব্যক্তি তোমার সাথে (ঈসার সম্বন্ধে) বিতর্ক করবে তাকে বল, 'আসো, আমাদের পুত্রদেরকে এবং তোমাদের পুত্রদেরকে আর আমাদের নারীদেরকে এবং তোমাদের নারীদেরকে এবং আমাদের নফসকে (নিজেদেরকে) এবং তোমাদের নফসকে (নিজেদেরকে) আহ্বান করি, অতঃপর আমরা মুবাহালা করি আর মিথ্যুকদের প্রতি আল্লাহর লানত (অভিসম্পাত) কামনা করি।' "

২- আয়াতের শাব্দিক সৌন্দর্য ও বলিষ্ঠতা

এই আয়াতে এক অপূর্ব সাহসিকতা, ন্যায়বিচার ও আধ্যাত্মিক আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছে।

এখানে আল্লাহ নিজেই রাসূলকে বলছেন, যদি সত্যের পরও তারা তর্ক চালিয়ে যায়, তখন মিথ্যা ও সত্যের মধ্যে ফয়সালার জন্য আল্লাহর দরবারে তাদের আহ্বান করো– সন্তান, নারী, এবং প্রাণসমূহ নিয়ে।

এই আয়াত শুধু একটি ধর্মীয় যুক্তি নয়, বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে এতই বলিষ্ঠ যে, তার প্রভাব যুগযুগ ধরে মানুষকে প্রভাবিত করেছে।

৩ - ঐতিহাসিক পটভূমি: নাজরানের খ্রিস্টানদের সাথে মুবাহিলা

ক) খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলের আগমন

ইতিহাসের বইগুলোতে পাওয়া যায়, দশম হিজরিতে (৬৩১ খ্রিস্টাব্দ) নাজরানের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের একটি প্রতিনিধি দল নবী করিম (সা.)-এর কাছে মদীনায় আসে। তাদের নেতৃস্থানীয় পাদ্রি ছিলেন আকিব, যিনি প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, এবং সাইদ যিনি ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁদের সাথে ছিলেন প্রায় ষাট জনের একটি বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে হযরত ঈসা (আ.)-এর মর্যাদা এবং তাঁর ঐশী পরিচয় নিয়ে বিতর্ক করা। নাজরানের খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করত যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র। অন্যদিকে, ইসলামে হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর প্রেরিত একজন সম্মানিত নবী এবং বান্দা হিসেবে স্বীকার করা হয়, কিন্তু আল্লাহর পুত্র হিসেবে নয়। মহানবী (সা.) তাদের সামনে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেন এবং কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন যে, ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ছিলেন, আল্লাহর পুত্র নন।

পবিত্র কুরআন স্পষ্ট বলেছে :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকটে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের ন্যায়। আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর বলেছেন 'হও', ফলে সে হয়ে গেল।"

দীর্ঘ আলোচনার পর যখন খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল তাদের অবস্থানে অটল থাকল এবং কোনো যুক্তিতর্ক বা প্রমাণ মানতে রাজি হলো না, তখন আল্লাহ তায়ালা আয়াতে মুবাহিলা নাজিল করলেন এবং তাদের সাথে মুবাহিলার নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ দুই পক্ষ তাদের প্রিয়জনদের নিয়ে সমবেত হবে, আল্লাহর দরবারে দু'পক্ষ একত্রে দোয়া করবে– যে মিথ্যা বলছে তার ওপর আল্লাহর লানত অবতীর্ণ হোক।

খ)- মুবাহিলার প্রস্তুতি

রাসূল (সা.) খ্রিস্টান নেতাদের বললেন, 'আমরা মুবাহিলা করব। অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব, যে মিথ্যা বলছে তার উপর আল্লাহর লানত নেমে আসুক।'

তারা প্রথমে প্রস্তুত হলেও পরে এভাবে বলল: 'আমরা এমন মুখমণ্ডল দেখছি, যারা যদি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, তাহলে পাহাড়কেও স্থানচ্যুত করতে পারে। আমরা মুবাহিলা করব না, বরং চুক্তি করব।'

গ) মুবাহিলায় আহলে বাইত (আ.)-এর সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ

১-নবী (সা.) কাদের নিয়ে গেলেন?

মুবাহিলার জন্য কুরআন বলেছে:

"أَبْنَاءَنَا" - আমাদের সন্তানদের

"نِسَاءَنَا" - আমাদের নারীদের

"أَنفُسَنَا" - আমাদের প্রাণসমূহকে

এখন দেখা যাক নবী (সা.)-এর নির্বাচিত পবিত্র সমাগম অর্থাৎ তিনি কাদেরকে সাথে নিলেন:

أَبْنَاءَنَا: সন্তানদের স্থানে হযরত ইমাম হাসান (আ.) ও হযরত ইমাম হুসাইন (আ.), যাঁরা তখন শিশু।

نِسَاءَنَا: নারীর স্থানে কেবল হযরত ফাতিমা (সা.আ.)– তাঁর একমাত্র কন্যা।

أَنفُسَنَا: নফসের স্থানে হযরত আলী (আ.)– যাঁকে নিজের প্রাণের সমতুল্য ঘোষণা করলেন।

২- গুরুত্বপূর্ণ হাদিস

■ আহলে সুন্নাতের প্রখ্যাত মুফাসসির ফখরুদ্দীন রাযী তাঁর তাফসীরে কাবীর-এ লিখেছেন: "তখন হযরত রাসূল (সা.) ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আ.)-এর হাত ধরলেন, হযরত ফাতিমা (সা.আ.) ও হযরত আলী (আ.)-কে নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং বললেন:'হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বাইত।' "

■ ইমাম বুখারী ও মুসলিমও এ আয়াতের ক্ষেত্রে এ প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেছেন।

■ ইমাম বায়হাকী তাঁর দালায়িলুন নবুওয়াহ-তে বলেন: 'রাসূল (সা.) যখন মুবাহিলায় যাচ্ছিলেন, তখন হাসান, হুসাইন, ফাতিমা ও আলীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এরা ছিলেন আহলে বাইতের প্রকৃত পরিচয়।'

আহলে বাইত (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের (আধ্যাত্মিক ও কালামি) অকাট্য প্রমাণ

১- কুরআনের ভাষা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব

■ কুরআন যখন বলে- أَنفُسَنَا, অর্থাৎ 'আমাদের প্রাণসমূহ', তখন নবী (সা.) আলী (আ.)-কে নিজের প্রাণের সমতুল্য করলেন। এটা স্পষ্টত হযরত আলীর একটি অদ্বিতীয় মর্যাদা। ইবনে হাজার আল-হায়তামী লিখেছেন: 'এ আয়াত আলী (আ.)-এর জন্য অতি উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ, কারণ, তাঁকে রাসূলের নফস বলা হয়েছে।'

■ "نِسَاءَنَا" অর্থাৎ এখানে নারীদের বলা সত্ত্বেও শুধু ফাতিমা (সা. আ.)-কে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এটি তাঁর অতুলনীয় মর্যাদার প্রমাণ।

আল-তাবারিতে (তাফসির ও ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ) বলা হয়েছে:

فَأَمَّا "نِسَاءَنَا" فَلَمْ يَأْتِ إِلَّا بِفَاطِمَةَ وَحْدَهَا، لِأَنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، وَلَا أَحَدَ يُقَارِبُهَا فِي الْفَضْلِ وَالطَّهَارَةِ۔

'আমাদের নারীদের' (نِسَاءَنَا) বলা হলেও রাসূল (সা.) কেবল ফাতিমা (সা. আ.)-কে সঙ্গে এনেছেন; কারণ, তিনি সমগ্র জগতের নারীদের নেত্রী, এবং মর্যাদা ও পবিত্রতায় তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

আল-আলূসী (সুন্নি তাফসিরকার) বলেছেন:

وَقَد اتَّفَقَ الْمُفَسِّرُونَ عَلَى أَنَّ "نِسَاءَنَا" فِي الْآيَةِ هِيَ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ فَقَطْ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شَرَفِهَا وَسُمُوِّ مَكَانَتِهَا عِندَ اللهِ وَرَسُولِهِ۔

"সব তাফসিরকারক একমত যে, 'আমাদের নারীদের' দ্বারা কেবল ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। এটি তাঁর মর্যাদা ও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট অবস্থানের স্পষ্ট প্রমাণ।"

মূল কথা হলো

■ কুরআনের "نِسَاءَنَا" শব্দটি বহুবচন হলেও বাস্তবে শুধু ফাতিমা যাহরা (সা. আ.)-কে নিয়ে যাওয়া হয় মুবাহিলার সময়।

■ এটি তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্তি, পবিত্রতা ও অনন্য মর্যাদার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

■ শিয়া ও সুন্নি উভয় তাফসির ও হাদিসগ্রন্থেই এই ব্যাখ্যা সমর্থিত।

২- আহলে বাইতের শাফা'আত ও পবিত্রতা

মুবাহিলা এমন একটি কঠিন পরীক্ষা, যেখানে মিথ্যাবাদীর উপর

আল্লাহর লানত অবিলম্বে নেমে আসত। নবী (সা.) তাঁর প্রিয় সন্তান, কন্যা ও জামাতাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, কারণ, তাদের পবিত্রতা ও সত্যবাদিতা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সুতরাং তাঁদের জীবনী, বাণী ও পথই সত্যের পরিপূর্ণ নিদর্শন।

যেমনভাবে এই বাক্যটি - لَوْلَا أَنَّ اللهَ عَرَّفَهُمْ بِالطَّهَارَةِ، لَمَا أَمَرَ رَسُولَهُ بِمُبَاهَلَتِهِم- একটি বিখ্যাত কালামি (থিওলজিক্যাল) যুক্তি যা বিশেষভাবে আহলে বাইত (আ.)-এর পবিত্রতা, মর্যাদা ও আয়াতে মুবাহিলা সম্পর্কিত আলোচনার প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ 'যদি আল্লাহ তাঁদের (আহলে বাইতকে) পবিত্রতার মাধ্যমে পরিচিত না করতেন, তবে তিনি কখনই তাঁর রাসূলকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে মুবাহিলায় অংশ নিতে আদেশ দিতেন না।'এই বাক্যটি অনেক প্রসিদ্ধ তাফসির ও কালামি গ্রন্থে যুক্তিতর্ক হিসেবে এসেছে।

৩- সুন্নি ও শিয়া উভয় সূত্রে সমর্থন

■ ইবনে হাজার আসকালানী, আল-সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ গ্রন্থে বলেছেন: 'মুবাহিলার দিনে আহলে বাইত ছাড়া আর কাউকে নবী (সা.) সঙ্গে নেননি। এতে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের স্পষ্ট প্রমাণ মেলে।'

■ শিয়া কিতাবসমূহ, যেমন: তাফসীর আল-মীযান, এবং ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে: 'এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, আহলে বাইত (আ.)-ই রাসূলের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।'

মুবাহিলার মাধ্যমে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়

১-খ্রিস্টান যাজকদের মুবাহিলা থেকে সরে দাঁড়ানো

নাজরানের খ্রিস্টান নেতারা প্রথমে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছিল যে, তারা মুবাহিলা করবে। কিন্তু যখন তারা মদিনার রাস্তায় নবী (সা.)-কে ফাতিমা (সা.আ.), আলী (আ.), হাসান (আ.) ও হুসাইন (আ.)-কে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখল, তখন তাদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল।

ইবনে সাদ লিখেছেন:"তারা বলল: 'আমরা এমন মুখমণ্ডল দেখছি, তাঁরা যদি আল্লাহর কাছে পাহাড় সরাতে প্রার্থনা করে, তবে পাহাড়ও নিজ স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যাবে। আমরা মুবাহিলা করব না, বরং চুক্তি করব।' "

ইবনে কাসীরও তাঁর তাফসীরে লিখেছেন: 'তারা মুবাহিলা থেকে পিছু হটে এবং করের শর্তে চুক্তি স্বীকার করল। এতে ইসলামের প্রভাব ও মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো।'

২- ইসলামের রাষ্ট্রনৈতিক ও কূটনৈতিক বিজয়

■ মুবাহিলার মাধ্যমে খ্রিস্টানরা ইসলামের প্রাবল্য স্বীকার করল।

■ মুবাহিলাতে হেরে যাওয়ার পর তারা (নাজরান খ্রিস্টানরা) জিযিয়া কর দিতে সম্মত হলো, অর্থাৎ তারা ইসলামি রাষ্ট্রের করদাতা নাগরিক হয়ে রইল।

এভাবে মুবাহিলা কেবল আধ্যাত্মিক নয়, রাষ্ট্রনৈতিক ও কূটনৈতিক ও সামরিক দিক থেকেও ইসলামের বিজয়ের এক বিশাল দিন ও এক বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

দার্শনিক ও কালামি দিক থেকে মুবাহিলা

১- মুবাহিলা একটি আধ্যাত্মিক পরীক্ষা

মুবাহিলা কেবল বাহ্যিক দোয়া নয়, এটি ছিল এমন একটি প্রার্থনা যেখানে আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ নেমে আসত মিথ্যাবাদীকে ধ্বংস করতে। এজন্য রাসূল (সা.) কেবল সেই মানুষদের নিলেন, যাঁদের আত্মার পবিত্রতা এত বিশুদ্ধ যে, আল্লাহর দরবারে তাঁদের উপস্থাপন করলেও লজ্জার কিছু থাকবে না।

মোল্লা সাদরা (صدرالمتألهين) লিখেছেন:

'মুবাহিলায় আহলে বাইত (আ.)-এর অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, তাঁদের আত্মা সর্বোচ্চ তাওহিদি নূরের আয়নায় বিকশিত। এ জন্যই আল্লাহ তাঁদেরকে মিথ্যা থেকে দূরে রেখেছেন।'

২- কালামি প্রভাব: আহলে বাইতের ইমামত ও হুজ্জিয়াত

মুবাহিলা থেকে আরেকটি তাৎপর্য বোঝা যায়– আহলে বাইত (আ.) সত্যের হুজ্জাত, যাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক। আর এই মুবাহিলার মাধ্যমে তাঁদের আল্লাহ-নির্ধারিত মর্যাদা ও নেতৃত্বের দায়িত্বও স্পষ্ট হয়ে যায়।

সমকালীন শিক্ষা ও আমাদের জন্য মুবাহিলার বার্তা

১- আহলে বাইতের (আ.) অনুসরণই সত্যের পরিচয়

মুবাহিলা আমাদের শিখিয়েছে– যদি কেউ আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখে এবং নিখাদ সত্যের পক্ষে দাঁড়ায়, আল্লাহ স্বয়ং তার সহায় হবেন। সত্যের পথে যে দৃঢ়, তারই শেষ পর্যন্ত বিজয়। আহলে বাইত (আ.) ছিলেন সত্যের মূর্ত প্রতীক। মহানবী (সা.) যখন মুবাহিলায় গেলেন, তাঁর কাছে কোনো বাহিনীর সাঁজোয়া বহর ছিল না; ছিল কেবল চারটি বিশুদ্ধ হৃদয়।

আজও যদি মুসলিম উম্মাহ তাঁদের চরিত্র, দয়া, সাহসিকতা, ইনসাফ ও ইখলাসের আদর্শে চলে, তাহলে দুনিয়ার সব জুলুম, বিভ্রান্তি ও কপটতা দূর হবে।

২- পরিবারকে সত্যের সংগ্রামে সঙ্গে নেওয়া

মুবাহিলায় রাসূল (সা.) তাঁর পরিবারকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে আমাদের শেখানো হয়েছে–

■ পরিবার ও সন্তানদেরও দ্বীনের শুদ্ধ পথে গড়ে তুলতে হবে।

■ সত্যের সংগ্রাম শুধু ব্যক্তিগত নয়, পরিবারকেও নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

আহলে বাইতের (আ.) আনুগত্যই মুক্তির গ্যারান্টি

১- নূহের নৌকার মতো আহলে বাইত (আ.)

নবী (সা.) বলেছেন:

مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ كَسَفِينَةِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ۔

'আমার আহলে বাইত তোমাদের মধ্যে নূহ (আ.)-এর নৌকার মতো। যে এতে আরোহণ করবে সে মুক্তি পাবে, আর যে বিমুখ হবে সে ডুবে যাবে।'

২-তাঁদের থেকে আলাদা হওয়া মানে ধ্বংস

আরও এসেছে:

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا۔

'আমি তোমাদের মধ্যে দুটি ভারি (মূল্যবান) বস্তু রেখে যাচ্ছি: আল্লাহর কিতাব এবং আমার বংশধর (অর্থাৎ) আহলে বাইত। তোমরা যতক্ষণ এ দু'টিকে আঁকড়ে থাকবে, কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।'

উপসংহার: আয়াতে মুবাহিলা চিরকাল আহলে বাইত (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের দলিল

মুবাহিলা কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরং এটি কুরআন দ্বারা মোহরাঙ্কিত অর্থাৎ নথিভুক্ত চিরন্তন দলিল ও চিরকালীনভাবে একটি দিব্য মানদণ্ড, যা বলে দিচ্ছে– আহলে বাইত (আ.)-ই ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন সত্যের প্রকৃত মূর্ত প্রতীক। তাঁদের হাত ধরেই নবী (সা.) মিথ্যা ও বাতিলের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে ফয়সালা চাইলেন। এটি প্রমাণ করে–

- আহলে বাইত (আ.) মিথ্যা ও পাপের ছোঁয়া থেকে চিরকাল পবিত্র।
- তাঁদের নীতি ও জীবনাদর্শই প্রকৃত ইসলামের প্রতিনিধি।
- এবং ইসলাম তাঁদের শাফাআতের দ্বারাই পূর্ণতা পায়।

মুবাহিলার দিনে আহলে বাইত (আ.)-কে নিয়ে নবী করিম (সা.) বেরিয়ে এসেছিলেন, কারণ, একমাত্র তাঁরাই ছিলেন এমন নিখুঁত, পবিত্র ও সত্যপরায়ণ যাঁরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারতেন।

এই আয়াত যুগ যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহকে আহলে বাইত (আ.)-এর প্রতি মহব্বত ও আনুগত্যের দিকে আহ্বান করছে।

নির্বাচিত উৎসসমূহ

- আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬১, ৫৯
- তাফসীরে কাবীর, ফখরুদ্দীন রাযী
- তাফসীর আল-মীযান, আল্লামা তাবাতাবায়ী
- সহিহ মুসলিম, কিতাব ফাদায়েল আহলে বাইত
- মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল
- আল-সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, ইবনে হাজার
- বিহারুল আনওয়ার, আল্লামা মাজলিসি
- তারিখে তাবারী, তাফসীরে তাবারী
- ইবনে হিশাম, সীরাহ
- ইবনে সাদ, তাবাকাত
- শেইখ মুফিদ, আল-ইখতিসাস
- তাফসীর নূরুস-সাকালাইন
- দালায়িলুন নবুওয়াহ, বায়হাকী
- আসরারুল আয়াত, মোল্লা সাদরা
- তিরমিযি, সুনান

নিউজ লেটারের গ্রাহক বিজ্ঞপ্তি

সম্মানিত গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিউজ লেটার নিয়মিত পেতে হলে ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বরাবর ১ বছরের গ্রাহক চাঁদা বাবদ ২০০ (দুইশত) টাকা +৮৮০ ১৮০৫-৪১৬৫৮১ নাম্বারে বিকাশ করে পিন নাম্বারসহ নিউজলেটার পাওয়ার ঠিকানাটি +৮৮০ ১৮০৫-৪১৬৫৮১ নাম্বারে এস এম এস করতে হবে।

যোগাযোগের সময়

সকাল ৯টা - বিকাল ৫টা (রবি-বৃহ:বার)

সার্কুলেশন বিভাগ, নিউজলেটার

বাড়ি নং-৭, রোড নং-১১ (পুরনো ৩২)
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯।

মোবাইল: +৮৮০ ১৮০৫-৪১৬৫৮১

ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ওয়েবসাইট

ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ওয়েবসাইট দেখুন
www.iranmirrorbd.com,
https://bn.icro.ir/Dhaka|
https://www.instagram.com/iran_cultural_center_dhaka/ (সোশ্যাল মিডিয়া)
এতে রয়েছে ইরানের শিল্প, সাহিত্য, সমাজ -সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানসহ নানা তথ্য। তাছাড়া থাকছে ফারসি ভাষা শিক্ষা, পবিত্র কুরআন, হাদিস ও ইসলামী দর্শনসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধসমূহ। কাজেই আর দেরি না করে ভিজিট করুন এ দু'টি ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া।

ইমাম খোমেইনী (রহ.) : বহুমুখী গুণের অধিকারী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব

জাফর বাঙ্গাশ

যে যুগে রাজনৈতিক নেতাদের ডিটারজেন্টের মতো প্যাকেজ করা এবং প্রচার করা হতো, সেই যুগে ইমাম খোমেইনির ব্যক্তিত্ব ব্যতিক্রমভাবে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। নিঃসন্দেহে তিনি সমসাময়িক ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব– এমনকি পশ্চিমা ভাষ্যকাররাও তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে এটি এখনও তাঁর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করে না, যার প্রভাব ইরানের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে বিস্তৃত। ইতিহাসে এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কিছু দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

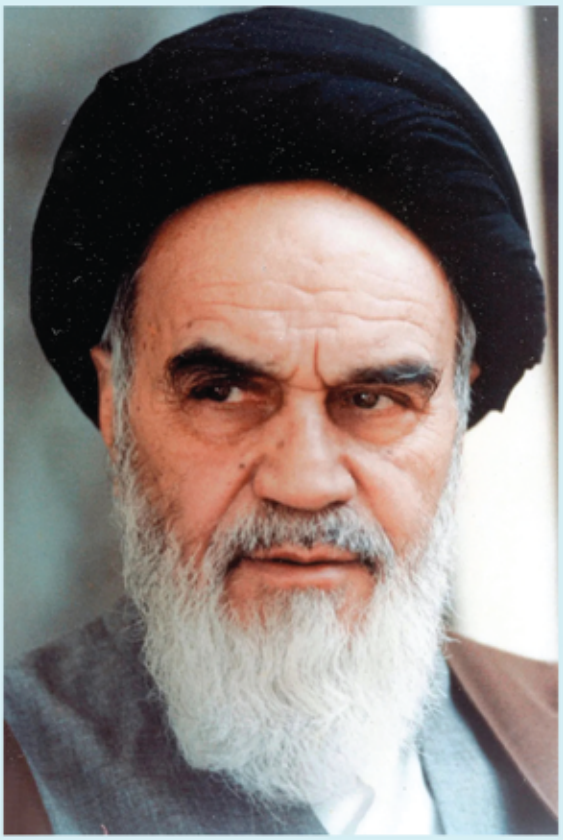

ইমাম খোমেইনি ইরানের এক অনন্য পটভূমি এবং ঐতিহ্য থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। তাঁর কাছে পার্থিব ক্ষমতা গ্রহণ ছিল লক্ষ্য নয়, বরং উচ্চতর এবং আরও মহৎ কিছু অর্জনের উপায়। রাজনীতিতে ইমামের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর গভীর আধ্যাত্মিকতা এবং আল্লাহর প্রতি আসক্তি দ্বারা গঠিত হয়েছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাসই তাঁকে সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর শক্তি দিয়েছিল যখন অন্যরা আপস করবে বা নতি স্বীকার করবে।

বিপ্লবের সময় বেশ কয়েকবার তাঁর কিছু সমর্থক তাঁকে শাহের সাথে আপস করার জন্য অনুরোধ করেছিল। কারণ, জনগণ আর কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে না। তিনি কেবল উত্তর দিতেন যে, আমাদের যা করণীয় তা করতে হবে এবং ফলাফল আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। তাঁর দৃঢ় সংকল্পই ইরানকে ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে বাথপন্থী ইরাকের মাধ্যমে ইরানে আক্রমণকারী বাহিনীর সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে একা প্রতিরোধ করতে সক্ষম করে তুলেছিল।

মহানবী (সা.) এবং ইমাম খোমেইনির জীবনের মধ্যে অসংখ্য মিল লক্ষ্য না করলে ইমাম সম্পর্কে কোনো গবেষণাই সম্পূর্ণ হবে না। মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার কিছুটা পরিমাপ এই সত্য থেকে পাওয়া যায় যে, তাঁর দুই পুত্র– মুস্তাফা ও আহমদ এর নামকরণ করা হয়েছিল মহানবী (সা.)-এর নামে। আল্লাহর রাসূলের মতো ইমামও অল্প বয়সে এতিম হয়েছিলেন এবং তাঁকেও নির্বাসনে যেতে হয়েছিল। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মহানবী (সা.) ১০ বছর বেঁচে ছিলেন; ১৪০০ বছর পরে ইমামের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে ইমামও অনেক সময় নামাজে কাটাতেন, বিশেষ করে রাত্রিতে, যে সময়ের নীরবতায় মানব আত্মা আল্লাহর আরও বেশি নৈকট্য অর্জন করে। আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত মানবীয় কর্মকাণ্ডই সাফল্যের একমাত্র পথ। এই ধরনের লক্ষ্য ছাড়া সম্পাদিত কর্ম ক্ষণস্থায়ী।

এই পটভূমি মাথায় রাখলে, এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইমাম কীভাবে অনেকের কাছে অসম্ভব বলে মনে হওয়া কাজটি সম্ভব করেছিলেন আর তা ছিল শাহের শাসনব্যবস্থার পতন, যার ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইরানে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলামি বিপ্লব ওই সময়ে সংঘটিত হয়েছিল যখন শাহের সাম্রাজ্যবাদী সেনাবাহিনী পশ্চিমাদের সরবরাহ করা অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। বলশেভিক বা ফরাসি বিপ্লবের মতো যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়নি। অন্যদিকে শাহের শাসনব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক শক্তি দ্বারা সমর্থিত ছিল।

ইমাম জনগণকে শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিতে উৎসাহিত করেননি। ইসলামি বিপ্লব যদিও সমসাময়িক ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবগুলোর মধ্যে একটি, যেখানে শাহের সেনাবাহিনী এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে প্রায় ৮০,০০০ মানুষকে হত্যা করেছিল, যার মধ্যে অনেক নারী ও শিশুও ছিল, তবুও এ বিপ্লব ধৈর্য ও ইতিবাচক প্রতিরোধের মাধ্যমে শক্তিকে জয় করেছিল। শাহের বিরুদ্ধে ইমামের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র ছিল রক্ত উৎসর্গ করা। ইরানের জনগণ তাদের মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগের বীরত্বপূর্ণ উচ্চতায় আরোহণ করেছিল। শাহের সৈন্যরা শেষ পর্যন্ত শহিদদের রক্তে ডুবে গিয়েছিল।

মুসলিম ইতিহাসের এই বিশেষ পর্যায়টি ইমামের কৃতিত্বের বিশালতার উপরও আলোকপাত করে। ইসলামি বিপ্লবের সময় মুসলিম বিশ্ব সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে পড়েছিল। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে তুরস্কে মুস্তাফা কামাল কর্তৃক খিলাফত–ইসলামি কর্তৃত্বের শেষ নিদর্শন–বিলুপ্ত করা হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের জুনে এবং এরপরও ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে পরাজয় ও অপমান মুসলমানদের মুখোমুখি হয়েছিল। মুসলিম উম্মাহ ইসলামের শত্রুদের কাছে মুসলিম সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের হতাশাজনক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিল।

ইসলামকে একটি সেকেলে মতাদর্শ হিসেবে উপস্থাপনের ফলে বাহ্যিক পরাজয় আরও জটিল হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদ, আরববাদ, সমাজতন্ত্র, বাথবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদির মতো পৈশাচিক ধারণা এবং পশ্চিমা ধ্যান-ধারণাপ্রসূত বিষয়–যা ইতোমধ্যেই ঈশ্বরের 'মৃত্যু' ঘোষণা করে দিয়েছিল–সর্বত্র রাজত্ব করছিল। মুসলিম বিশ্ব জুড়ে ইসলামি কর্মীরা তাদের পরিশ্রমের ফল দেখার আগে দীর্ঘ সময়ের কঠোর সংগ্রামের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে বলে মনে হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতেই ইমামের ইসলামি বিপ্লবের ডাক অন্ধকারের

সমুদ্রে বিদ্যুৎ চমকের মতো এসেছিল। তবে, তাঁর সামনে আরও বৃহত্তর কাজ ছিল। ইমামকে প্রথমে দ্বাদশ ইমামের অন্তর্ধান চলাকালীন সমস্ত রাজনৈতিক কার্যলাপ থেকে বিরত থাকা শিয়া গোঁড়ামিকে তাদের অনমনীয় অবস্থান থেকে সরিয়ে নিতে হয়েছিল। এটি ছিল একটি বিশাল কাজ, কিন্তু ইমাম আল্লাহর নির্দেশনার মাধ্যমে এটি মোকাবেলা করেছিলেন।

আঠারো শতকে শিয়া পণ্ডিতদের মধ্যে যে উসূলি চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছিল, তার উপর ভিত্তি করে, শিয়া আলেমদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী আখবারি ধারণার পরিবর্তে ইমাম ইসলামি সরকারের ভিত্তি হিসেবে একটি সক্রিয় বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি 'বেলায়াতে ফকিহ' তত্ত্ব বিকশিত করেন। এই ধারণাগুলো ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে নাজাফে (ইরাকে, যেখানে তিনি নির্বাসনে থাকতেন) ধারাবাহিক বক্তৃতাগুলোতে উপস্থাপন করা হয়েছিল। তাঁর ছাত্ররা এই আন্দোলনের পক্ষে কাজ শুরু করেন, যা ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ে পরিণত হওয়া সংগ্রামের ভিত্তি তৈরি করে।

ইমাম নির্বাসনে ছিলেন এবং জনগণের সাথে তাঁর সরাসরি কোনো যোগাযোগ ছিল না, তবুও তিনি এই বাধা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে প্রচলিত মাধ্যম ব্যবহার করতেন। তাঁর বক্তৃতা টেলিফোনে প্রচারিত হতো এবং তাঁর অনুসারীরা রেকর্ড করতেন। এরপর হাজার হাজার টেপ করা কপি সারা দেশে বিতরণ করা হতো। মামুলি অডিও-ক্যাসেট মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যম হয়ে ওঠে। মসজিদগুলোকে একত্রিতকরণ এবং প্রতিরোধের কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছিল, যা সেগুলোকে সেই মর্যাদায় ফিরিয়ে আনে যার জন্য আল্লাহর মহান রাসূল মদিনায় প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

ইসলামি বিপ্লব পশ্চিমাদের প্রিয় মানুষটিকে উৎখাত করার পর, বিপ্লব এবং ইমাম উভয়ই তাদের জঘন্য প্রচারণার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ইমাম যদি পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্তিকে ঘৃণা করতেন, তবে পশ্চিমা ভাষ্যকাররা এটিকে তাকিয়া (প্রতারণা) এর শিয়া অনুশীলন বলে অভিহিত করতেন। নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদক Elaine Sciolaini এর মন্তব্যটি অদ্ভুত : তিনি রিপোর্ট করেছেন যে, ১৫ বছর নির্বাসনের পর তেহরানে তাঁর বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে তিনি কেমন অনুভব করছেন জানতে চাইলে ইমাম উত্তর দিয়েছিলেন, 'কিছুই না।' Elaine Sciolaini এর নিকট এ কথার অর্থ ছিল ইমাম তাঁর প্রকৃত অনুভূতি প্রকাশ করছিলেন না।

কিন্তু পাশ্চাত্য প্রায়শই বুঝতে ব্যর্থ হয় যে, পশ্চিমাদের মতো সকলেই এই পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত নয়। মুসলমানরা, বিশেষ করে যাঁরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছেন, তাঁরা এই পৃথিবীর জীবনকে ক্ষণস্থায়ী বলে মনে করেন। অবশেষে তাঁরা পৃথিবীতে তাঁদের অবস্থানের হিসাব দেওয়ার জন্য স্রষ্টার মুখোমুখি হবেন। ইমাম ঠিক এমনই একজন মুসলিম ছিলেন; তিনি পশ্চিমাদের রীতি অনুসারে গড়া নেতা ছিলেন না, যারা উচ্চ পদে নির্বাচিত হওয়ার আনন্দ ধরে রাখতে পারে না, অথবা ব্যর্থ হলে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ইমামের জীবনের প্রথম দিকেই দুনিয়া থেকে এই বিচ্ছিন্নতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তাঁর ছোট মেয়ে পুকুরে ডুবে মারা যায়।

স্বাভাবিকভাবেই তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়েন। খবরটি শুনে ইমাম প্রথমে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন। তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করেন : 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন (আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।' (সূরা বাকারা : ১৫৬)। কেবল গভীর আধ্যাত্মিকতার অধিকারী একজন ব্যক্তিই এইভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন।

১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে ইমাম নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পর তেহরানে আনুমানিক ত্রিশ লক্ষ মানুষ তাঁকে স্বাগত জানায়; ১৯৮৯ সালের জুনে তাঁর জানাজায় ১ কোটিরও বেশি মানুষ যোগ দেয়। কর্তৃপক্ষকে দূরবর্তী অঞ্চলের লোকদের তেহরানে না আসার জন্য অনুরোধ করতে হয়েছিল। কারণ, শহরের পরিষেবাগুলো এত সংখ্যক মানুষকে সেবা দিতে সক্ষম ছিল না। একজন নেতার প্রতি এত গভীর ভালোবাসার উদাহরণ পৃথিবীতে আর কয়টি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে?

বিশ্বজুড়ে এত 'বিপ্লবী' নেতার রীতির বিপরীতে, ইমাম শাহ কর্তৃক খালি করা কোনো প্রাসাদে বাস করেননি। তিনি একটি সাধারণ বাড়িতে থাকতেন যেখানে কেবল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছিল এবং তিনি সাধারণ খাবার খেতেন। যখন তিনি মারা যান, তখন তিনি কয়েকটি বই ছাড়া কিছুই রেখে যাননি। এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লব ঘটানো এই মহান ব্যক্তির সম্পদের সমষ্টি ছিল এইটুকুই। একজন প্রকৃত আল্লাহপ্রেমী মানুষই এভাবে বেঁচে থাকতে পারেন। ইরান বিষয়ক একজন শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত অধ্যাপক হামিদ আলগার 'মুনাজাতে শাবানিয়া' থেকে ইমামের একটি প্রিয় বাণী উদ্ধৃত করেছেন : 'হে আমার আল্লাহ, সবকিছু থেকে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধু আপনার দিকে নিন এবং আমাদের অন্তরের দৃষ্টিকে আলোকিত করুন উজ্জ্বল সাদা আলো দিয়ে যা আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে, যেন অন্তরের দৃষ্টি আলোর পর্দাগুলো ভেদ করে যায়, ফলে তা মর্যাদার উৎসের সাথে যুক্ত হবে এবং আপনার পবিত্রতার সম্মানের সাথে আমাদের রুহগুলো যুক্ত হয়ে ঝুলে থাকবে।'

আল্লাহ ইমাম খোমেইনির বিদেহী আত্মার প্রতি রহম করুন এবং তাঁকে তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের মধ্যে জান্নাতে স্থান দিন।

লেখক : পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব কনটেম্পোরারি ইসলামিক থট (আইসিআইটি

অনুবাদ : মোঃ আশিফুর রহমান

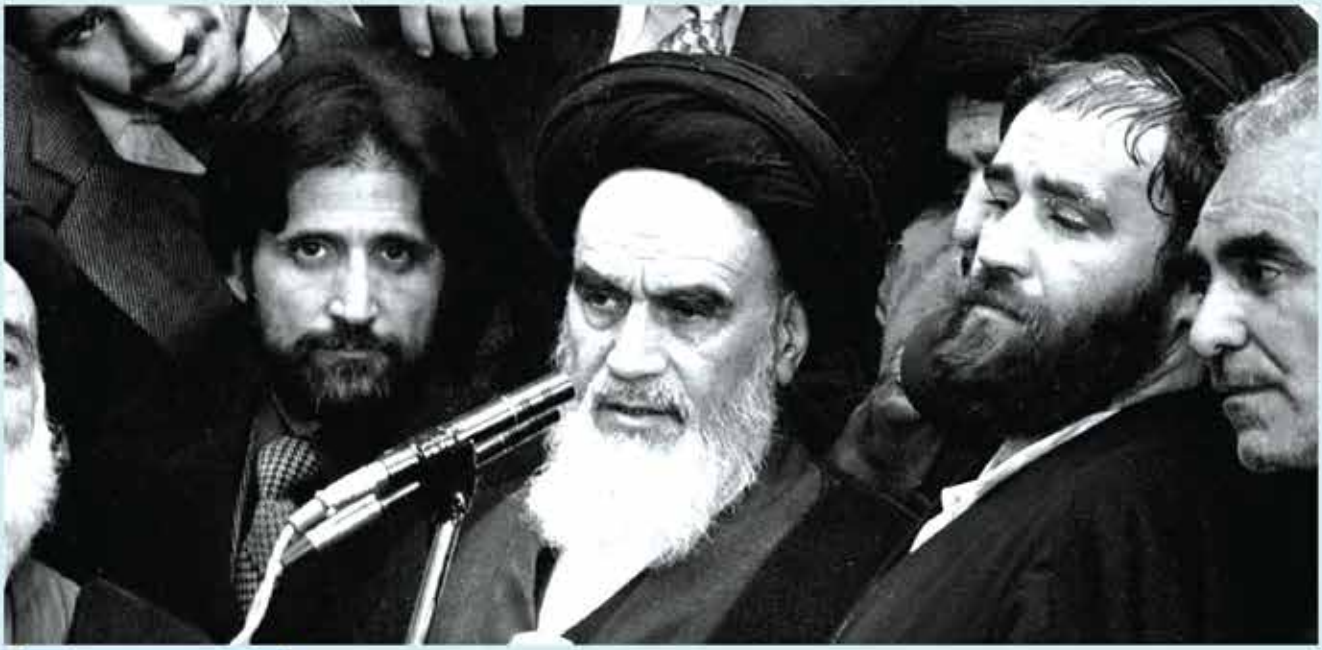

ইরানের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড

আহমদ আতিক

ইরানের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের লড়াই মূলত এক ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড। পশ্চিমা সমাজের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য এবং তাদের কার্যকলাপ থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। আরব ও মুসলিম বিশ্ব এ বিষয়ে নীরবতা পালন করছে। এক্ষেত্রে শাসকশ্রেণি নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য নীরব। পাশাপাশি বিরাট সংখ্যক মুসলমানেরও কোনো ভূমিকা দৃশ্যমান নয় বা তারা বিষয়টিকে এড়িয়ে চলে। অন্যদিকে খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলো তাদের সেনা ঘাঁটি ও অবস্থান তৈরির মাধ্যমে হাদিসে বর্ণিত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাহায্যকারী অঞ্চল খোরাসান এবং ইয়েমেনকে ঘিরে ফেলেছে এবং আক্রমণ শুরু করেছে। ইসরাইলের ইরানে আক্রমণ এবং ইয়েমেনে পশ্চিমাদের আক্রমণ তারই প্রমাণ। একইসাথে পশ্চিমা সমাজের নেতৃবৃন্দের বক্তব্যেও দেখা যায় যে, তাঁরা ইমাম মাহদী (আ.)-এর ইন্তেজার বা শেষ সময়ের ধারণাকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের অটল বিশ্বাসের প্রতি এক ধরনের স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন। আর সবশেষে দখলদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে ইরানের জয়ের মাধ্যমে এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা এখন সবার সামনে। আর এ বিশ্বব্যবস্থার নেতৃত্ব এখন ইরানের হাতেই। সাধারণের কাছে এটি দৃশ্যমান হতে তা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর শাসনামলে ইসলাম বোঝার জন্য হোয়াইট হাউজে একজন ইসলাম বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিয়েছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে বাইডেন বলেছেন, ইসলামের খুটিনাটি বিষয় সম্পর্কে আমি কত কম জানি। আমি অল্প কিছু জানতাম, কিন্তু এর মাঝে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে তা জানা ছিল না। আমার জানা ছিল না, এই গায়েবে থাকা ইমাম কী?

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমরা ইরানকে নিষেধাজ্ঞা দিই, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, ইমাম মাহদী শেষ যুদ্ধে পশ্চিমের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন এবং পৃথিবী শাসন করবেন। এটা রাজনীতির বিষয় নয়। এটা প্রলয়কালীন (অ্যাপোক্যালিপটিক) বিশ্বাস।

অন্যদিকে ইউরোপের একটি টেলিভিশনে সাক্ষাৎকারের সময় দখলদার ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে তিনবার প্রশ্ন করা হয় ইসরাইলের শত্রু কে? এর জবাবে সে তিনবারই বলেছিলো, ইরান, ইরান এবং ইরান।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দখলদার ইসরাইল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরান আক্রমণ তাদের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের অংশ। খুবই লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, পশ্চিমা সমাজ দীর্ঘদিন যাবত এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এজন্য তারা পশ্চিম এশিয়ার (মধ্যপ্রাচ্য) ইরানকে কেন্দ্র করে তাদের সেনা উপস্থিতি জোরদার করেছে দীর্ঘদিন যাবত।

মূলত গাজায় ফিলিস্তিনিদের উপর দখলদার ইসরাইলের নির্মম হত্যাকাণ্ডের ফলে এ সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে ইয়েমেনের হুথি এবং লেবাননের হিজবুল্লাহ আন্দোলন। এদিকে ২০১১ সালে সিরিয়ায় ঈঙ্গ-মার্কিন জোটের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয় সরকার উৎখাতের কর্মকাণ্ড। তথাকথিত গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে আসাদ সরকারকে উৎখাতের আন্দোলন শুরু হলেও এর মূল লক্ষ্য ছিল দখলদার ইসরাইলকে নিরাপদ করা। ফলে লেবাননের প্রতিরোধ

আন্দোলন হিজবুল্লাহকে সরে আসতে হয় সিরিয়া থেকে এবং পতন ঘটে সিরিয়ার সরকারের। সিরিয়া হয়ে উঠে দখলদার ইসরাইলের চারণ ভূমি। এ সংঘাতের জের ধরেই ইরানে হামলা করে বসে দখলদার ইসরাইল। ফলে এর জবাব দেয় ইরান। এভাবে কয়েক দফা হামলা করে দখলদাররা। ইরান খুবই কৌশলে এসব হামলার জবাব দেয়।

তবে দখলদারদের উপর ইরানের হামলার বিষয়েও একদল মানুষের ছিল দারুণ সংশয়। ইরান কেন ট্রু-প্রমিজ-থ্রি'র ঘোষণা দিয়েও বাস্তবায়ন করছে না, এ নিয়ে নানা কথাবার্তা বলছিল তারা। তাদের বক্তব্য ছিল, ইরান আসলে ফাঁকা বুলি ছুড়ছে। তারা কখনো দখলদারদের উপর হামলা করবে না, দখলদারদের উপর হামলার সামর্থ্য ইরানের নেই। তারা কিছু পুরনো আমলের পটকার মতো ড্রোন উড়িয়েই খুশি। শুধুই তাদের কথামতো হামাস, হুথি আর

বেশ কয়েকজন শীর্ষ সামরিক কমান্ডার শহিদ হন। সাইবার হামলায় রাডার ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ইরানের প্রতিবেশী দেশগুলোর আকাশসীমা ব্যবহার করে ইরানে হামলা চালায় ইসরাইল। কিন্তু ইমাম আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর নেতৃত্বে ১০/১২ ঘণ্টার ব্যবধানেই ইরান ঘুরে দাঁড়ায় এবং দখলদারদের উপর পাল্টা হামলা চালায়, সক্রিয় হয় প্রতিরক্ষাসহ সব রাডার ব্যবস্থা। ১২ দিনে ইরান গুঁড়িয়ে দেয় হানাদার দেশটির সকল ধরনের প্রতিরক্ষা ও রাডার ব্যবস্থা, সামরিক ও সাবমেরিন ঘাঁটিসহ গুপ্তচর সংস্থার সদর দপ্তর, হাইফা সমুদ্রবন্দর এবং মারণাস্ত্র গবেষণা কেন্দ্র। তেলআবিবকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে, এটি গাজা না তেলআবিব। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর দেশগুলোর সহায়তায় গত প্রায় ৬ দশকে মধ্যপ্রাচ্যে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠা দখলদার দেশটির ইহুদি বাসিন্দারা প্রথমবারের মতো

হিজবুল্লাহ যুদ্ধে নেমে নিজেদেরকে শেষ করে দিল। কোথায় দখলদার ইসরাইল আর সর্বশ্রেষ্ঠ আমেরিকা (তাদের ভাষায়)। ইরানে হামলা হলে কিছুই করার থাকবে না। সবশেষ, দখলদারদের ইরানে গুপ্তহত্যা মিশনে ইরানের সব শেষ হয়ে গেল, এমন আক্ষেপ ছিল চোখে পড়ার মতো। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, টেলিভিশন এবং সংবাদমাধ্যমগুলোতে আলোচক, বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্লেষকরাও বিভিন্নভাবে এমন কথাই বলছিলেন। হায় হায় ইরান তো নিজের পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বকেও শেষ করে দিল! ইরান কখনোই পশ্চিমাদের সমকক্ষ নয়। মার্কিনিদের সাথে যুদ্ধে ইরান কয়েক দিনও টিকতে পারবে না।

এরই মধ্যে গত ১৩ জুন শুক্রবার ইরানে ইসরাইল হামলা করে বসে। যদিও এর অধিকাংশই ছিল গুপ্ত হামলা। এর ফলে ইরানের

আতঙ্কিত হয়ে পরে এবং দেশটি ছেড়ে পালানো শুরু করে।

অথচ এসময়ও বিভিন্ন লোকজন ইরানের বিরুদ্ধে নানা বক্তব্য দিয়ে চলছিল। অন্যদিকে সবচেয়ে দৃশ্যমান ঘটনা ঘটে সাধারণ মানুষের মননে। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে তারা দেখতে পায় অন্য এক ইরানকে। সাধারণ মানুষ দেখল একজন ইমামকে। ইরানিদের নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী একজন হোসাইনী সাইয়্যেদ। মহানবী (সা.)-এর বংশধর। তাদের চিন্তার জগৎ আরেকবার ধাক্কা খেলো, যখন অকুতোভয় ইমাম বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, আমি কিংবা ইরান গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ।

আর এর ফলেই ঘুরে গেল পুরো জনমত। মানুষ দেখতে পেল

নতুন এক ইরানকে। তারা বুঝতে পারল, এই ইরান নতুন ইরান। আর তাদের নেতা ইমাম খামেনেয়ী শুধু ইরানের নেতা নন, তিনিই হলেন মুসলিম বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা। দখলদারদের বিরুদ্ধে পুরো ১২ দিনের যুদ্ধও একটি নতুন নিদর্শন। ঠিক ৫৮ বছর পরের জুনে প্রথমবারের মতো আরবদের 'কলঙ্ক' মুছল ইরান। ১৯৬৭ সালের জুনেই দখলদার ইসরায়েলের সঙ্গে ৬ দিনের যুদ্ধে নাস্তানাবুদ হয়েছিল আরব দেশগুলো। আর ইরান সেখানে বিজয় অর্জন করেছে। বাংলাদেশের মানুষ এই যুদ্ধের সময় বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখার মতো রাত জেগে জেগে যুদ্ধের খবরাখবর দেখেছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমে।

এ যুদ্ধে ইরানে হঠাৎ করেই হামলা করে বসে মার্কিনিরা। প্রতিরোধে ইরানও কাতারে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা চালালো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটা দ্বিতীয় কোনো মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা। ইরান সেই ঘাঁটিতে পাল্টা আঘাত করে জানিয়ে দিয়েছে, তোমাদের যেখান থেকে চক্রান্ত শুরু, আমরা সেখানেই প্রতিরোধ শুরু করব।

পশ্চিমা খ্রিস্টানরা প্রথমে কূটনীতি, তারপর প্রতিরক্ষা চুক্তি, এরপর গোয়েন্দা সহযোগিতা এভাবেই মুসলিম ভূমি দখল করেছে। তারা এভাবেই মুসলিম দেশগুলোকে কব্জায় রেখেছে। ইহুদিবাদীরা অস্ত্র আনেনি প্রথমে, এনেছে 'মুসলমান মুখোশধারী সহযোগী'। এখানেও আমরা তাই দেখতে পাই। মুসলিম দেশগুলোর ঘাঁটি হয়ে উঠেছে পশ্চিমা আগ্রাসনের ডেরা। যারা 'উম্মাহ' বলে বক্তৃতা দেয়, তারা ব্যাকস্টেজে চুক্তি সই করে ইসরাইলি মন্ত্রীদের সঙ্গে। এখানেও আমরা তাই দেখতে পাই।

অথচ ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলাগুলো জায়নবাদী শত্রুর জন্য এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। তারা এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে, যা তাদের ইতিহাসে আগে কখনো হয়নি। তারা এখন জানে, এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর বিরুদ্ধে তারা কিছুই করতে পারবে না।

তবে আশার কথা হলো, ইসরাইলের বিরুদ্ধে ইরানের জয়ের মাধ্যমে এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা এখন সবার সামনে। আর এ লড়াইয়ের মাধ্যমেই এর শুরু হলো। জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইউহিরো হাতোয়ামা বলেছেন, আফসোস! জাপান যদি ইরানের মতো হতো। আমাদের এমন এক জাপান গড়ে তুলতে হবে, যেখানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি থাকবে না।

গাজা ও ফিলিস্তিন বিষয়ক দুটি প্রতিবেদন

এক
বর্তমান গাজা পরিস্থিতি

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় কার্যালয় (OCHA)-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ৬০,০০০-এরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে এবং ১,২৫,০০০-এরও বেশি আহত হয়েছে। হামাস এবং অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠী দক্ষিণ ইসরাইলে মারাত্মক স্থল আক্রমণ এবং রকেট হামলা শুরু করার পর ইসরাইলি বাহিনী বিমান হামলা এবং স্থল অভিযান শুরু করে। জানা গেছে, হামাস কর্তৃক গৃহীত ২০০ জনেরও বেশি জিম্মির মধ্যে ৫৮ জন এখনও গাজায় আটক রয়েছেন।

দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা সংঘাতের ফলে ২০ লক্ষেরও বেশি ফিলিস্তিনি, যাদের অর্ধেকই শিশু, পর্যাপ্ত পানি, খাদ্য বা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। গাজায় তীব্র মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে।

গাজায় ভয়াবহ পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে- যার মধ্যে রয়েছে পরিষ্কার জল, নগদ অর্থ, শৈশবকালীন শিক্ষা, নিরাপত্তা উদ্বেগ।

২০ মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধের ফলে গাজা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। OCHA অনুসারে, ইসরাইলি বিমান হামলা, বোমা হামলা এবং ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে স্থল পর্যায়ের লড়াইয়ে ৬০,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে; ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, স্কুল, আশ্রয়স্থল, ধর্মীয় স্থান এবং বেকারির মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাসহ গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস হয়েছে। পুরো গাজা জুড়ে কোনও নিরাপদ স্থান না থাকায় ফিলিস্তিনিদেরকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তারা খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা পরিষেবা পেতে লড়াই করছে।

গাজার ৯০% এরও বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে, যার ফলে বেশিরভাগ ফিলিস্তিনি স্থায়ী এবং নিরাপদ থাকার জায়গা থেকে বঞ্চিত। মানুষ তাঁবু বা অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিচ্ছে যা নিরাপত্তা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়।

সংঘাতে আহত বেসামরিক নাগরিক এবং দৈনন্দিন স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন, তারা ক্রমশ মৌলিক চিকিৎসা পেতে অক্ষম। গাজার ৩৬টি হাসপাতালের প্রায় অর্ধেক আংশিকভাবে কার্যকর এবং সেখানে কর্মীর অভাব, সঠিক চিকিৎসা সরবরাহের অভাব এবং রোগীদের উপচে পড়া ভিড়। আইআরসির কাছে ৬ টনেরও বেশি জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রস্তুত এবং গাজায় প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করছে, যা হাজার হাজার মানুষের চিকিৎসা করবে এবং ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করবে। তবুও গাজায় প্রবেশের উপর ইসরাইলের বর্তমান প্রায় সম্পূর্ণ অবরোধের কারণে এই সরঞ্জামগুলো সরবরাহ করাটা অনিশ্চিত।

এই অবস্থায় সবচেয়ে সংকটজনক পরিস্থিতিতে রয়েছে শিশুরা। তাৎক্ষণিক শারীরিক বিপদের বাইরেও ক্রমাগত স্থানচ্যুতি, পরিবারের সদস্যদের হারানো এবং শিক্ষা ব্যাহত হওয়ার মানসিক আঘাত দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব তৈরি করতে পারে– যা একটি সম্পূর্ণ প্রজন্মকে প্রভাবিত করবে।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অধীনে মানবিক সাহায্য সরবরাহ সহজতর করার আইনি বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও ইসরাইলি সরকার গাজায় সাহায্য প্রবেশে বাধা দিচ্ছে।

গাজা হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ) এবং বেসরকারি মার্কিন নিরাপত্তা সংস্থাগুলো দ্বারা বাস্তবায়িত ইসরাইলি সরকারের নতুন সাহায্য প্রকল্পের অধীনে খাদ্য বিতরণের সময় বিশৃঙ্খলা এবং বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার দৃশ্য দেখা দিয়েছে। সাহায্য সরবরাহের এই পদ্ধতি কেবল অকার্যকরই নয়; বরং বিপজ্জনকও প্রমাণিত হয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলো বেসামরিক জনসংখ্যার ব্যাপক জোরপূর্বক স্থানচ্যুতির দিকে

পরিচালিত করবে, চলাচলের সমস্যা এবং শিশুদের মতো দুর্বল গোষ্ঠীগুলোর সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে এবং গাজার মানবিক সংকটে সাড়া দেওয়া প্রায় অসম্ভব করে তুলবে।

আইআরসি-এর জরুরি অবস্থা এবং মানবিক পদক্ষেপের ভাইস প্রেসিডেন্ট বব কিচেন ব্যাখ্যা করেন, 'গাজার পুরো জনগোষ্ঠী বর্তমানে মানবিক ত্রাণের উপর নির্ভরশীল এবং যখন বেশিরভাগ জনগণ ক্ষুধার সংকটের মুখোমুখি, এমন একটি সময়ে সাহায্য আটকে দেওয়া ইতোমধ্যেই হতাশ বেসামরিক জনগোষ্ঠীর জন্য সুদূরপ্রসারী পরিণতি বয়ে আনবে।'

পণ্যের দামের ঊর্ধ্ব গতি, কঠোর অবরোধ, তীব্র জ্বালানি ঘাটতি সাহায্য সরবরাহের চ্যালেঞ্জগুলোকে আরও জটিল করে তুলছে। ইসরাইল কর্তৃক গাজায় মানবিক সাহায্য প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া এবং চলমান যুদ্ধের ফলে ত্রাণকর্মীরা ঝুঁকির মুখে পড়েছে। ফলে পুষ্টি কর্মসূচি ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। থেরাপিউটিক খাবারের সরবরাহ কমে যাচ্ছে এবং চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছানো দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে।

আন্তর্জাতিক উদ্ধার কমিটি (IRC) সকল পক্ষকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মেনে চলা, বেসামরিক নাগরিক এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো রক্ষা করা এবং গাজায় মানবিক সাহায্য সরবরাহ অবিলম্বে বৃদ্ধি করার আহ্বান জানিয়েছে। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে, যুদ্ধবিরতি হলো ফিলিস্তিনিদের জীবন সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করার, জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করার এবং মানবিক সাহায্যের নিরাপদ সরবরাহ নিশ্চিত করার সর্বোত্তম উপায়।

তা সত্ত্বেও IRC পুষ্টি, বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি পরিষেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছে, পাশাপাশি কিছু সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় শিশু সুরক্ষাও প্রদান করছে।

গাজা দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। দশ লক্ষেরও বেশি ফিলিস্তিনি খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, অবস্থা দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে। বাজার প্রায় খালি, প্রধান প্রধান পণ্যের দাম বেড়েছে এবং পরিবারগুলোকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

ক্ষুধা এবং দুর্বল স্যানিটেশন অবস্থার কারণে তীব্র অপুষ্টি এবং রোগের ঝুঁকি বাড়ছে। ইতোমধ্যেই প্রতিদিন শিশুদের অনাহারে মারা যাওয়ার প্রতিবেদন পাওয়া যাচ্ছে। IRC কর্মীরা জানিয়েছেন যে, পাঁচ বা ছয় সদস্যের পরিবারগুলো এক টুকরো রুটি ভাগ করে নিচ্ছে এবং শিশুদের নিয়মিত ক্ষুধার্ত ঘুমাতে হচ্ছে।

দুই

নিন্দা করা সত্ত্বেও যে দেশগুলো ইসরাইলের সাথে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে

ইসরাইল যখন বিমান হামলা চালিয়ে দ্রুত গতিতে এবং অনাহারে রেখে ধীর গতিতে ফিলিস্তিনিদের হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, তখন ২৮টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গাজার বিরুদ্ধে ইসরাইলের যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন। জাতিসংঘ এবং অন্যান্য গোষ্ঠী আসন্ন দুর্ভিক্ষের সতর্কীকরণের কয়েক মাস পরে এই দেশগুলো যখন কথা বলছে, তখন অন্যান্য ফ্রন্টে খুব কম পদক্ষেপই দেখা যাচ্ছে।

এই দেশগুলোর মধ্যে কয়েকটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে, অন্যদিকে ফ্রান্স সেপ্টেম্বরে একই পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে

ইসরাইলি কর্মকর্তাদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তবুও, অনেক সমালোচক উল্লেখ করেছেন যে, দেশগুলো এই বিবৃতি দেওয়ার পরেও তাদের অনেকেই ইসরাইলের সাথে বাণিজ্য থেকে লাভবান হচ্ছে এবং ইসরাইলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি বা অন্য কোনও পদক্ষেপ নেয়নি যা ইসরাইলকে গাজার উপর গণহত্যা বন্ধ করতে বাধ্য করতে পারে। উল্লেখ্য, যুদ্ধে গাজায় কমপক্ষে ৫৯,৮২১ জন নিহত এবং ১,৪৪,৪৭৭ জন আহত হয়েছে।

২০২৩ সালের অর্থনৈতিক জটিলতা পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা অবজারভেটরি থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, জাপান, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, স্পেন, সুইজারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যের ইসরাইলের সাথে আমদানি, রপ্তানি অথবা উভয় ক্ষেত্রেই ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি বাণিজ্য রয়েছে।

দেশগুলো ইসরাইলের সাথে কোন পণ্যের ব্যবসা করে?

ইসরাইলের সাথে এসব দেশের যেসব পণ্যের ব্যবসা সবচেয়ে বেশি হয় তার মধ্যে রয়েছে গাড়ি ও অন্যান্য মোটরযান, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, ভ্যাকসিন এবং পারফিউম। আয়ারল্যান্ডে প্রায় ৩.৫৮ বিলিয়ন ডলারের ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট পণ্য সবচেয়ে বেশি আমদানি করা হয়, যা ইসরাইল থেকে আয়ারল্যান্ডের আমদানির সিংহভাগ। এদিকে, বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় ইতালি ইসরাইলে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে। ২০২৩ সালে তাদের ৩.৪৯ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানির মধ্যে ১১৬ মিলিয়ন ডলারের গাড়ি ছিল।

এই দেশগুলো কি ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়?

বিবৃতি জারি করা দেশগুলোর মধ্যে আয়ারল্যান্ড ও স্পেন ২০২৪ সালে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং গাজায় ইসরাইলের কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তবুও এটি তাদেরকে

ইসরাইলের সাথে বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখেনি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী আরও সাতটি দেশও ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়, যার মধ্যে রয়েছে সাইপ্রাস, মাল্টা ও পোল্যান্ড, যারা ১৯৮৮ সালে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়।

আইসল্যান্ড (২০১১), সুইডেন (২০১৪), নরওয়ে (২০২৪) এবং স্লোভেনিয়া (২০২৪)ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যেখানে ফ্রান্স এই সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এটি করার কথা জানিয়েছে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী দেশ

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো হলো অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, সাইপ্রাস, ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, গ্রিস, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, জাপান, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবার্গ, মাল্টা, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, স্লোভেনিয়া, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য। কিন্তু সবগুলো দেশ এখনও ইসরাইলের সাথে ব্যবসা করে যাচ্ছে।

বিবৃতিতে ইসরাইলের প্রতিক্রিয়া

যেমনটি ধারণা করা হয়েছিল তেমনি ইসরাইলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ওরেন মারমোরস্টাইন এক্স-এ লিখেছেন যে, ইসরাইল বিবৃতিটি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে যে, 'এটি বাস্তবতা-বিবর্জিত এবং হামাসকে ভুল বার্তা পাঠায়।'

ইসরাইলের সাথে ব্যবসা করা দেশগুলোর আহ্বান

ইসরাইল কর্তৃক অবরোধ ও ত্রাণ সরবরাহে বাধা দেওয়ার পর যুদ্ধ এবং ক্ষুধা সংকট নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি জরুরি বৈঠকে মিলিত হয়ে ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাজ্য গাজায় 'তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি' এবং 'সকল জিম্মিকে নিঃশর্ত মুক্তি' দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

এর কোনোটি কি ইসরাইলকে তার আচরণ পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছে?

গাজায় ফিলিস্তিনিদের দুর্ভিক্ষের দিকে মনোযোগ ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, এমনকি প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের মতো দীর্ঘ দিনের ইসরাইল সমর্থকরাও এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছেন।

এই চাপের কারণে ইসরাইল 'মানবিক উদ্দেশ্যে' স্থানীয় সময় সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আল-মাওয়াসি, দেইর এল-বালাহ এবং গাজা সিটিতে 'কৌশলগত বিরতি' ঘোষণা করেছে। ২৭ জুলাই থেকে এই বিরতি শুরু হয়েছে। কিন্তু বিরতি সত্ত্বেও ওই দিন ভোরে ইসরাইলি বাহিনী কমপক্ষে ৪৩ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে।

গাজার ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গত ২৭ জুলাই জানিয়েছে যে, এ পর্যন্ত অনাহারে মৃত্যুর মোট সংখ্যা ১৩৩ জনে দাঁড়িয়েছে, যার মধ্যে ৮৭ জন শিশু। সূত্র : আল-জাজিরা

নিজামি গাঞ্জুবির কাব্যে রোমান্টিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধ

ড. মো. আতাউল্যাহ

(দ্বিতীয় পর্ব)

খসরু ওয়া শিরিন (خسرو و شیرین)

'খসরু ওয়া শিরিন' কবি নিজামি গাঞ্জুবির এক অনবদ্য প্রণয়োপাখ্যান। এতে পারস্য সম্রাট খসরু, অনন্যা সুন্দরী রূপবর্তী ষোড়শী শিরিন ও প্রস্তর খোদাইকারী দরিদ্র যুবক ফরহাদের ত্রিভুজ প্রেম কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে অত্যন্ত রোমান্টিকভাবে। প্রচলিত রোমান্টিকতার মাঝে সাধারণত নায়ক-নায়িকার প্রেমের ধারাবাহিক চিত্র পরিলক্ষিত হয়। একটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালবাসার ক্ষেত্রে প্রথম যে পর্বটি ফুটে উঠে তা হলো পূর্বরাগ।

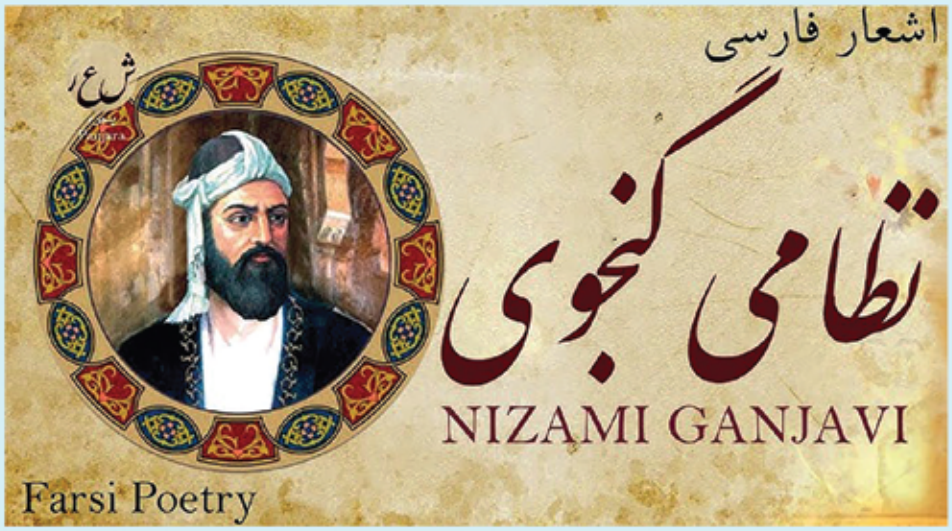

রোমান্টিকতার ক্ষেত্রে পূর্বরাগ হলো ঐ অনুভূতি 'একজন ছেলে তার মনের মধ্যে স্বপ্নের একটি মূর্তির চিত্রাঙ্কন করেছে এবং গভীরভাবে ঐ লালিত স্বপ্নকে ভালবাসে।' সময়ের ব্যবধানে যখন স্বপ্নের ঐ রাজকুমারীকে পেয়ে যায় তখন তার হৃদয়ের গভীরে অনুরাগের জন্ম নেয়। অনুরাগ থেকে মনের মুকুরে জাগ্রত হয় অভিসারের প্রেরণা। আর অভিসারের মাধ্যমে ঘটে মিলন। মিলনের মাধ্যমেই রোমান্টিকতা পূর্ণতা লাভ করে। পরিপূর্ণ এ রোমান্টিকতার পরবর্তী স্তর হলো বিরহ। বিরহের মাধ্যমে প্রেম খাঁটি হয়। সোনা যেমন পুড়ে খাঁটি হয়, প্রেমও তেমনি বিরহ-বিচ্ছেদের যন্ত্রণা সহ্য করে খাঁটি প্রেমে পরিণত হয়। নিজামি গাঞ্জুবির 'খসরু ওয়া শিরিন' কাব্যগ্রন্থে রোমান্টিকতার এমনই কয়েকটি স্তর ফুঠে উঠেছে।

নারী সৃষ্টির এক অপূর্ব রহস্য। যার সৌন্দর্যচ্ছটায় বিমোহিত হয় পুরুষ। কবি নিজামি রচিত এ কাব্যগ্রন্থে এমনই একজন প্রেমিক পুরুষ হলেন খসরু। যিনি বুকের ভিতর একজন রূপবতী নারীর ছবি এঁকেছিলেন। যা শিরিনের অবয়বের সাথে হুবহু মিলে যায়। তাই শিরিনকে প্রথমবার দেখেই হৃদয় তাঁর প্রেমানলে জ্বলে উঠে। প্রেমানলের এ দহন থেকে মুক্তির জন্য তিনি শিরিনকে জীবনে কামনা করলেন নিষ্ঠার সাথে। জীবনের প্রথম দর্শনেই রোমান্টিকতার যে অনুভূতি খসরুর মনে উদয় হয়েছিল তাই কবি 'খসরু ওয়া শিরিন' কাব্যগ্রন্থে ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে। যেমন এ প্রসঙ্গে কবি বলেন,

دلی کان نار شیرین کار دیده
زحسرت گشته چون نار کفیده
بدان چشمه که جای ماه گشت
عجب بین کافتاب از راه گشته

'হৃদয় যখন শিরিনের অগ্নিময় চেহারা অবলোকন করল,
তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ক্ষুধার্ত হয়ে গেল।
তাঁর চক্ষুদ্বয় এমন যেন চাঁদ দ্বারা আচ্ছাদিত,
আশ্চর্যজনক যে প্রজ্জ্বলিত সূর্য যেন তাঁর রূপের আলোতে আচ্ছাদিত।'

নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পেছনে রূপ-সৌন্দর্যই অন্যতম কারণ। তবে রূপের পাশাপাশি গুণ ও নৈপুণ্যও পুরুষকে নারীর প্রতি মুগ্ধ হতে ও প্রেমে জড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। খসরুও ঠিক এমনিভাবে শিরিনের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। কেননা, শিরিন দেখতে ছিল অপরূপা সুন্দরী, যাকে দেখে একজন পুরুষ আকৃষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক। কবি নিজামি এভাবেই অত্যন্ত রোমান্টিকভাবে শিরিনের রূপের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর কাব্যগ্রন্থে। কবি বলেন,

پری دختی پری بگذار ماهی
بزیر مقنعه صاحب کلاهی
شب افروزی چو مهتاب جوانی
سیه چشمی چو آب زندگانی

'পরী চেহারা ও চন্দ্রবদনী কন্যা,
হিজাবের নিচে টুপির অধিকারিণী।
রাতকে প্রজ্বলনকারী যেন পূর্ণিমার চাঁদ,
কাজল কালো চোখ যেন জীবন্ত পানি।'

শিরিন ছিল সুন্দরীর এক বিরল দৃষ্টান্ত। রূপে-গুণে যার কোনো কমতি ছিল না। কবি কখনো তার রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে তাকে বাগানের ফুটন্ত ফুল, আবার আকাশের জ্বলন্ত চাঁদ, আবার পাহাড়ের প্রবাহিত ঝরনার সথে তুলনা করেছেন। তার গাল দু'টিকে ইয়েমেনের রক্তবর্ণ আক্বীক পাথর ও তার ঠোঁটকে তুলনা করেছেন একনিষ্ঠ প্রেমিকের সাথে। গালে বসিয়েছেন প্রেমের তিলক যাকে দেখে আসক্ত হবে হাজারো প্রেমিক পুরুষ। তার চক্ষুদ্বয়কে তুলনা করেছেন হরিণীর সাথে। তার কানকে তুলনা করেছেন উজ্জ্বল জীবন্ত মুক্তার সাথে, যা থেকে হাজারও প্রেমাস্পদ তার প্রেমে পড়বে। তার দাঁতগুলোর তুলনা করেছেন স্বর্ণ-মুক্তারাজির সাথে, যার হাসিতে দূর থেকে আলো চমকাতে থাকে আর মুক্তা ঝরে। সবশেষে কবি শিরিনকে বেহেশতের হুরের সাথে তুলনা করেছেন। কবির দৃষ্টিতে হুরেরা বেহেশতে সুন্দর আর এ জগতে শিরিন হচ্ছে বেহেশতের হুরসদৃশ। কবি নিজামি এখানে শিরিনকে তার রূপ ও গুণের বর্ণনা করতে গিয়ে এমন বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন যাকে দেখে খসরুর ন্যায় হাজারো প্রেমাস্পদ তার রূপের সুধা পান করে প্রেমের তৃষ্ণা নিবারণে উদগ্রীব হবে।

প্রত্যেকটি রোমান্টিক কাহিনীতেই সুখের সাথে দুঃখ ও মিলনের সাথে বিরহের একটা দৃশ্য আবর্তিত হয়। যার মাধ্যমে কাহিনীর নাটকীয়তায় স্থান পায় আরও গভীরতা ও পাঠক হৃদয়কে নাড়া দেয় আরেকটু সজোরে। বিনিময়ে বৃদ্ধি পায় কাহিনীর গ্রহণযোগ্যতা ও সাবলীলতা। কবি নিজামি গাঞ্জুবিও তাঁর এ রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যানে বিরহের অবস্থানকে তুলে ধরেছেন শক্তভাবে।

রূপে ও গুণে রূপায়িত শিরিনের প্রেমে আসক্ত হয়ে খসরুর মনে অভিসার ও মিলনের মাধ্যমে রোমান্টিকতার পূর্ণতা পেতে সাধ জাগে। সময়ের ব্যবধানে তা বাস্তবে রূপও লাভ করে। আর এ মিলনের মধ্য দিয়েই খসরু ও শিরিনের রোমান্টিক প্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রত্যেকটি রোমান্টিক কাহিনীতেই সুখের সাথে দুঃখ ও মিলনের সাথে বিরহের একটা দৃশ্য আবর্তিত হয়। যার মাধ্যমে কাহিনীর নাটকীয়তায় স্থান পায় আরও গভীরতা ও পাঠক হৃদয়কে নাড়া দেয় আরেকটু সজোরে। বিনিময়ে বৃদ্ধি পায় কাহিনীর গ্রহণযোগ্যতা ও সাবলীলতা। কবি নিজামি গাঞ্জুবিও তাঁর এ রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যানে বিরহের অবস্থানকে তুলে ধরেছেন শক্তভাবে। খসরু ও শিরিনের মধুর মিলনের পর যখন খসরু বাদশাহ বাহরামের সাথে যুদ্ধের জন্য বের হয়, তখন তাদের মাঝে বিরহের ঘণ্টা বেজে উঠে। শিরিন কোনোভাবেই তাদের এ বিরহকে মেনে নিতে পারছিল না।

মিলন, বিরহ ও রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি এ কাব্যগ্রন্থে সত্য উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে রোমান্টিকতার নিষ্কলুষ চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছেন নিরলসভাবে। বিরহের যন্ত্রণায় শিরিনের মন সবসময় উদাসীন থাকত। চোখ থেকে নিদ্রা যেন চির বিদায় নিয়েছিল আর মগজ যেন খসরুর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তার প্রেমাস্পদ মন বিষাদের কষ্টে হয়েছিল অনুভূতিশূন্য। হৃদয় তার ভেঙ্গে হয়েছিল ছিন্নবিচ্ছিন্ন। লাবণ্যময় চেহারা তার দিনে দিনে হয়ে উঠে শুষ্ক এবং সুমিষ্ট কণ্ঠ তার হারিয়ে ফেলে বাকশক্তি। যে শিরিনকে দেখে তার রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হতো হাজারো প্রেমাস্পদ, সে যেন আপনজনের বিরহে আজ পরিণত হয়েছে প্রাণহীন একটি দেহে। বিরহ যন্ত্রণার এ হৃদয়ানুভূতিসম্পন্ন কথাগুলোকে কাব্যাকারে উপস্থাপনের মাধ্যমে কবি নিজামি 'খসরু ওয়া শিরিন' কাব্যগ্রন্থকে করে তুলেছেন আরও সর্বজনীন। যেমন কবি শিরিনের বিরহের কথা উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন,

ز خواب ایمن هوسهای دماغنش
زبیخوابی شده چشم و چراغش
دهن خشک و لب زگفتاربسته
زدیده بر سر گوهر نشسته

'তার দেমাগ নিরাপদ ঘুম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে,
তার চোখ ও চোখের আলো নির্ঘুম হয়ে পড়েছে।
তার মুখ হয়েছে শুষ্ক আর ঠোঁট হয়েছে নির্বাক,
মণি-মুক্তার ন্যায় দৃশ্যমান সুন্দরী আজ স্থবির হয়ে পড়েছে।'

'খসরু ওয়া শিরিন' কাব্যগ্রন্থটি মূলত একটি ত্রিভুজ প্রেমকাহিনী। আর এ কাহিনীতে আরেকজন নায়ক হলো ফরহাদ। পেশায় সে যদিও ছিল একজন প্রস্তর খোদাইকারী, কিন্তু প্রেমের ইতিহাসে তার নাম অনেক উর্ধ্বে। প্রেয়সী শিরিনকে ভালবেসে উৎসর্গ করেছিল নিজের জীবনকে আর স্মরণীয় হয়ে আছে বিশ্বের প্রেম ইতিহাসে। ফরহাদ প্রথম দর্শনেই শিরিনের প্রেমে পড়ে যায়। সে প্রেয়সীর প্রতি এত বেশি আসক্ত হয়েছিল যে, এক পর্যায়ে সে ভুলেই গিয়েছিল শিরিনের পরিচয়ের কথা। শিরিনের প্রতি তার ভালবাসার গভীরতার কোনো মাপকাঠি ছিল না। পৃথিবীর যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে হলেও শিরিনকে পাওয়ার জন্য সে ছিল বদ্ধপরিকর। শিরিনের অপরূপ সৌন্দর্য তার মন কেড়ে নিয়েছে অতি দ্রুততার সাথে। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন,

پری پیکر نگار پرنیان پوش
بت سنگین دل سیمین بناگوش
در آن وادی که جائی بود دیگر
نخوردی هیچ خوردی خوشتراز شیر

'পরিপূর্ণ আবৃত পরীসদৃশ চেহারা তার,
যেন রৌপ্যমণ্ডিত উদার হৃদয়সম্পন্ন প্রতিমা।
সেই উপত্যকায় যেখানে (তাকে দেখে) মন হয়েছিল বিষণ্ন,
কিছু গ্রহণ করনি যা কিছুই গ্রহণ করেছ তা প্রেয়সীর উত্তম পানপাত্র।'

এভাবেই সূচনা হয় শিরিনের সাথে ফরহাদের রোমান্টিক সম্পর্ক। পৃথিবীর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ফরহাদ। জগতের কোনো

মোহই যেন তাকে আর আকর্ষণ করে না। শুধু শিরিনকে চিন্তা করেই কেটে যায় তার সময়। তার কথা, চিন্তা-চেতনা, চলাফেরা, অনুভূতি সর্বত্রই বিরাজমান ছিল শিরিনের নাম। কবির ভাষায়,

زشیرین گفتن وگفتار شیرین
شده هوش از سر فرهاد مسکین

'শিরিনের কথামালা ও বক্তব্য হতে,
ফরহাদ জ্ঞান ফিরে পেয়েছে নিঃস্বতা থেকে।'

ফরহাদ শিরিনের প্রেমে আসক্ত হয়ে দুনিয়াবি সকল চিন্তা-চেতনা থেকে দূরে সরে যায়। তার জীবনে এ জগৎ সংসারের মায়া বলতে আর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। সকাল, দুপুর ও রাত সর্বদা সে শিরিনকে নিয়েই মগ্ন। অন্তরাত্মা তার শিরিনের বিষাদে বিধ্বস্ত। যে দিকে তাকায় শুধু শিরিনকেই দেখতে পায়। এমন বিষণ্ন অবস্থায় দিনাতিপাত করার প্রাক্কালে তার এ পাগলামি ও প্রেমাসক্তির সংবাদ শিরিনের কানে পৌঁছে। শিরিন তখন এ প্রেমাসক্ত ফরহাদকে দেখার ইচ্ছা পোষণ করে এবং পরবর্তীকালে তার নিকট আগমন করে। হৃদয়ের এ আকুতিগুলোকেই কাব্যাকারে উপস্থাপন করেছেন কবি নিজামি, যা এক রোমান্টিকতারই সফল বহিঃপ্রকাশ। ফরহাদের নিকট শিরিনের আগমন সম্পর্কে কবি বলেন,

خبر بردند شیرین را که فرهاد
بماهی حوضه بست وجوی بگشاد
چنان کز گوسفندان شام و
شبگیر
بحوض آید بپای خویشتن شیر
بهشتی پیکر آمد سوی آن دشت
بنگرد جوی شیرو حوض برگشت

'শিরিনকে খবর দেয়া হল যে,
চৌবাচ্চার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে অববাহিকা খুলে গেছে।
মেষ ও রাতের পাখির খাবার হতে,
চৌবাচ্চার দিকে পদব্রজে এসেছে সিংহের ভয়ে।
বেহেশতের হুর এসেছে ঐ মরুভূমিতে,
পানির ঝরনার দিকে দৃষ্টি দিল আর চৌবাচ্চা বন্ধ হয়ে গেল।'

প্রেম, ভালবাসা ও রোমান্টিকতার ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র, বাদশাহ-উজির, গোলাম-মালিক এর হিসেব চলে না। প্রেম বুঝে না কোনো জাতি-ধর্ম, কুল-জাত, বংশ মর্যাদা, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও মানে না কোনো বিচার-বিশ্লেষণ। সকল ক্ষেত্রেই প্রেম অন্ধ। প্রেমের জন্য শুধু প্রেমই দরকার, অন্য কোনো হিসেবই প্রেমের হিসেবের সাথে মিলে না। তাই বলা হয়ে থাকে প্রেমের রাজ্যে পাটিগণিত আর বীজগণিত একই ধারায় চলে। কবি নিজামি গাঞ্জুবিও তাঁর এ রোমান্টিক কাব্যগুলোকে কাহিনীকারে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছেন একই ধারা। আর এ জন্যই রোমান্টিকতা আনয়নের মাধ্যমে পাঠক হৃদয়কে প্রেমাবেগে উদ্বেলিত করার ক্ষেত্রে তিনি হয়েছেন সফল।

দরিদ্র প্রস্তর খোদাইকারী যুবক ফরহাদও প্রেমের ক্ষেত্রে কোনো আপোস করেনি। নিজে একজন সাধারণ মানুষ হলেও হাত বাড়িয়েছিল পারস্য সম্রাট খসরুর প্রেয়সী শিরিনের দিকে। জগতের সবকিছু একদিকে আর তার প্রেয়সী শিরিনকে রেখেছে অন্যদিকে। তারপরও শিরিনই তার নিকট বেশি গুরুত্ব ও প্রাধান্য পেয়েছে। তাই সে নিজের অবস্থানের কথা ভুলে গিয়ে সকল ভয়কে উপেক্ষা করে সমাজে ঘোষণা দিয়ে নির্বাক এ পৃথিবীকে সাক্ষী রেখে ভালবেসেছিল প্রেয়সী শিরিনকে। তার বুকে এতটুকু ভয়ের সঞ্চার হয়নি যে, সে একজন বাদশাহর প্রেয়সীকে ভালবেসেছে। আর প্রেমের ক্ষেত্রে এটাই যেন চিরসত্য। রোমান্টিকতার এ উন্মাদনাকে কাব্যাকারে প্রকাশ করে কবি নিজামি হয়েছেন রোমান্টিক কাব্যের কর্ণধার। ফরহাদের এই নির্ভীক ও উন্মুক্ত রোমান্টিকতার কথা বলতে গিয়ে কবি বলেন,

چو دل مهر شیرین بست فرهاد
بر آورد از وجودش عشق فریاد
بسختی میگذشتش روزگاری
نمی آمد زدستش هیچ کاری

'যখন ফরহাদ তার হৃদয়কে শিরিনের সাথে আবদ্ধ করল,
তার ভিতর থেকে প্রেমের আর্তনাদ বেরিয়ে আসল।
দিনাতিপাত করতে লাগল অনেক কষ্টে,
তার দ্বারা আর কোনো কাজ করাই সম্ভব হলো না।'

ফরহাদ যখন শিরিনের প্রেমে দিশেহারা, উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন এ সংবাদ খসরুর নিকট পৌঁছে। খসরু প্রথমে আশ্চর্য হন তার সাহস দেখে, কিন্তু পরবর্তীকালে এটাকে তিনি নিছক পাগলামি মনে করেন। খসরুর নিকট ফরহাদের প্রেম সম্পর্কে উপস্থাপন করতে গিয়ে কবি নিজামি তাঁর রোমান্টিক কাব্যকে ব্যক্ত করেছেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে। যেমন কবির ভাষায়,

یکی محرم ز نردیکان درگاه
فروگفت این حکایت جمله با شاه
که فرهاد از غم شیرین چنان شد
که در عالم حدیشش داستان شد

'বাদশাহর নিকটতম আত্মীয়দের মধ্যে একজন,
এ ঘটনা পরিপূর্ণভাবে বাদশাহর নিকট বললেন।
ফরহাদ শিরিনের চিন্তায় এমন উদ্বিগ্ন হয়েছে যে,
সারা দুনিয়ায় এটা গল্পাকারে রূপ লাভ করেছে।'

প্রেম মানুষকে শিখায় সাহসী, উদ্দীপক ও আত্মবিশ্বাসী হতে। নিজামি গাঞ্জুবি তাঁর রোমান্টিক কাব্যে এ বিষয়গুলোকে তুলে ধরেছেন নিজস্ব ভঙ্গিমায় অত্যন্ত চমৎকারভাবে। যার দ্বারা তিনি পাঠক মহলে হয়েছেন আরও নন্দিত ও গ্রহণযোগ্য।

প্রেম মানুষকে শিখায় সাহসী, উদ্দীপক ও আত্মবিশ্বাসী হতে। নিজামি গাঞ্জুবি তাঁর রোমান্টিক কাব্যে এ বিষয়গুলোকে তুলে ধরেছেন নিজস্ব ভঙ্গিমায় অত্যন্ত চমৎকারভাবে। যার দ্বারা তিনি পাঠক মহলে হয়েছেন আরও নন্দিত ও গ্রহণযোগ্য। যেমন খসরু ফরহাদের প্রেম সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তাকে দরবারে আমন্ত্রণ জানান এবং নিজ কানে ফরহাদের প্রেমের অভিব্যক্তি শুনে তিনি রীতিমত বিস্ময়াভিভূত হন। ফরহাদ ও খসরুর মধ্যে রোমান্টিক প্রেমের কথোপকথন কবির কাব্যের শোভা বৃদ্ধি করেছে আরও কয়েকগুণ। কবির ভাষায়,

بگفتا جان فروشی در ادب نیست
بگفت از عشقبازان در عجب نیست
بگفت از دل شدی عاشق بدینان
بگفت از دل تو میگوئی من از جان
بگفتا عشق شیرین برتو چونست
بگفت از جان شیرینم فزونست
بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب
بگفت آری چو خواب آید کجا خواب

'তাকে (খসরু) বলল, জীবন বিপন্ন করা এটা কোনো শিষ্টাচারে নাই,
সে (ফরহাদ) বলল, প্রেমের খেলায় এটা আশ্চর্যজনক নয়।
তাকে (খসরু) বলল, তুমি কি তাকে মন থেকে ভালবাস?
তুমি বলতে পার প্রাণের চেয়ে বেশি তাকে ভালবাসি।
তাকে (খসরু) বলল, শিরিনের প্রতি ভালবাসা তোমার উপর কেমন প্রভাব ফেলেছে?
সে (ফরহাদ) বলল, আমার জীবনের চেয়ে তাকে বেশি ভালবাসি।
তাকে (খসরু) বলল, প্রতি রাতেই কি তাকে তুমি চাদের ন্যায় দেখ,
সে (ফরহাদ) বলল, হ্যা যখনই ঘুমাই তখন স্বপ্নে দেখি।'

ফরহাদের প্রেমানুভূতির কথা শুনে খসরু তাকে বলেন, 'তুমি যদি বিস্তৃন পর্বতমালা কেটে এপারের স্রোতস্বিনী জলধারা ওপারে প্রবাহিত করতে পার তবেই তুমি শিরিনকে পাবে।' ফরহাদের বুক তখন প্রেমানলের দহনে ছিল দগ্ধ। তাই এ দহন থেকে মুক্তি ও প্রেয়সীর সাথে মিলনাকাঙ্ক্ষায় অকপটে মেনে নেয় খসরুর দেওয়া শর্ত। প্রেম কখনো কোনো বাধা-বিপত্তি কিংবা শর্ত দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। এ কথাকেই তিনি প্রমাণ করেছেন কাব্যাকারে। আর চেষ্টা করেছেন রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান হিসেবে 'খসরু ওয়া শিরিন'কে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে।

ফরহাদ প্রাণের চেয়ে প্রিয় শিরিনকে জীবনে নিজের করে পেতে শুরু করেন বিস্তৃন পর্বতমালা কাটার কাজ। কবে পর্বতমালা কাটা শেষ হবে আর আপন করে পাবে প্রেয়সীকে তার জীবনে– এ চিন্তাকে বুকে ধারণ করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে একাগ্রচিত্তে কাজ করে যাচ্ছে ফরহাদ। অসাধ্য সাধনের কামনা নিয়ে পর্বতের এক গুহায় আশ্রয় নিল সে। আর পর্বতের এক পাশে অংকন করল প্রেয়সী শিরিনের শিলামূর্তি, যাকে দেখে প্রতিনিয়ত উদ্বেলিত হয় তার মন, ফিরে পায় কঠিন এক জীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মানসিক শক্তি। এখানে কবি নিজামি প্রেমের যে এক অদৃশ্য শক্তি রয়েছে তা কাব্যাকারে উপস্থাপন করে এ অনুভূতিকে পাঠক মহলে উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ত নির্মলভাবে। রোমান্টিক কাব্যে এই যে অতি নাটকীয়তা, যা পাঠ করার সাথে সাথে হৃদয় শিহরিত হয়ে উঠে, তা এ কাব্যে আনয়ন করে নিজের কাব্যপ্রতিভারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন কবি নিজামি।

প্রভাত কুঞ্জনে দিবসের আগমনী ঘন্টা যখন বেজে ওঠে তখনই ফরহাদের কুঠার ব্যস্ত হয়ে পড়ে পর্বত কাটায়। পূর্বাকাশের প্রথম অরুণিমা যখন পর্বত গা রঞ্জিত করে ফরহাদের কুঠার তখন সে উজ্জ্বল স্বর্ণ আভায় ঝলসে ওঠে। আর ক্ষণে ক্ষণে ফরহাদ তার প্রিয়তমা শিরিনের নাম উচ্চারণ করে প্রেরণা যোগায় আপন অনুভূতিতে। দিন-ক্ষণ ক্রমে অবসন্ন হয়, ক্লান্ত সূর্য অস্ত-গিরির কোলে এলিয়ে পড়ে, তখনও ফরহাদের কুঠারের শব্দ দিগন্তের কোলে প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে। সান্ধ্য কুহেলির রক্তাক্ত আস্তরণে সারা গিরি উপত্যকা ঢেকে যায়। তখনও ফরহাদের কুঠার অবিশ্রান্ত চলছে। এভাবে ক্রমে সেই শিলাক্ষেত্রে এক গভীর খাদ খনন হলো। ধাপে ধাপে জলস্রোত তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হতে কলনাদে নেমে আসল। মেঘ গর্জনে সে ধারা প্রবাহিণী সৃষ্টি করে দিগন্তের পানে

ছুটল। ফরহাদ তখনও কর্মরত। ক্রমে তার নিপুণ হস্তের আবেগমাখা স্পর্শে সকল শিলাস্তূপ নানা মানসী মূর্তিতে ফুটে উঠল। তার মানস কল্পিত সকল চিত্র পাথর মূর্তিতে জীবন্ত হয়ে উঠল। নানা দিক হতে ভাস্করেরা তাঁর যশোগান শুনে দেখতে আসতে লাগল। যারাই দেখল সবাই বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইল।

ফরহাদের দুঃখের নিশা অবসান প্রায়। হৃদয়ের অপ্রকাশিত আশাগুলো তার মলিন মুখখানিকে রঙিন করছে। এমন সময় খসরুর নিকট থেকে একজন দূত এসে তাকে বলল, বাছা কেন এ প্রাণান্তকর পরিশ্রম? তোমার শিরিন কি আর এ দুনিয়ায় বেঁচে আছে? দুই সপ্তাহ পূর্বেই যে সে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছে।

ফরহাদের মাথায় হঠাৎ বজ্রাঘাত হলেও সে হয়তবা এতটা কাতর হতো না। তার আর বেঁচে থাকার ইচ্ছে থাকল না। তার অন্তরের অন্তস্তল নিংড়িয়ে একবার ক্ষীণ শিরিন শব্দটা দীর্ঘ প্রশ্বাসের দ্বারা বের হয়ে আসল। হাত দুটি উর্ধ্বে উত্থিত হলো। রোদ্রোজ্জ্বল কুঠার ঝকঝক করে সুদূর শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলো। আর ফরহাদ সেই তুঙ্গগিরি শিখর হতে একলাফে শিরিনের নাম উচ্চারণ করে অতল তলে লুটিয়ে পড়ল। শিরিনের শোকে চির বিদায় নিল ফরহাদ। এ ত্রিভুজ প্রেমের আবেগময় বর্ণনার মাধ্যমেই 'খসরু ওয়া শিরিন' প্রেমোপাখ্যানের পরিসমাপ্তি টানেন কবি নিজামি গাঞ্জুবি। প্রেম মানুষকে অমর করে, বিখ্যাত করে, জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে, দুঃখের গহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত করে, মিলনের স্বর্গীয় সুধা দান করে, আবার জীবনকে কেড়ে নেয় মায়াময় এ পৃথিবী থেকে। এটাই প্রেমপ্রকৃতির খেলা মানুষ নামের এ অসহায় প্রাণীর সাথে।

'খসরু ওয়া শিরিন' কাব্যগ্রন্থে কবি নিজামি খসরু, শিরিন ও ফরহাদের ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী রূপায়ণ করেছেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে। এখানে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ফরহাদের আত্মত্যাগ। কালজয়ী এ প্রেমিক পুরুষের জীবনের চাওয়া খুব বেশি কিছু ছিল না। সে চায়নি কোনো দিন পারস্যের রাজত্ব ও রাজমুকুট, চায়নি হতে পৃথিবীতে খ্যাতিমান মহাপুরুষ, কিংবা বীরযোদ্ধা, বিশ্বজয়ী মহাবীর কোনোকিছুই না। যা চেয়েছিল তা ছিল নিতান্তই নগণ্য আর তা হলো ভালবাসার মানুষকে আপন করে পাওয়া। চেয়েছিল পৃথিবী নামক এ সুন্দর মায়ারণ্যে মিলনের স্বর্গীয় সুধা পান করতে। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, সুধা পান করল ঠিকই তবে তা মিলনের না হয়ে হলো বিরহের। যা তাকে দিল পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেয়ার মতো এক চমৎকার উপহার। এ কাব্যগ্রন্থে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, তা হলো প্রত্যেকটি প্রণয়োপাখ্যানই মিলন কিংবা বিরহ যে কোনো এক জায়গায় গিয়ে শেষ হয়। কিন্তু এখানে কবি নিজামি এমনভাবে ফরহাদের মৃত্যুর মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি টেনেছেন যেখানে সাধারণ পাঠকের চাহিদা শেষ হওয়ার আগেই মঞ্চের পর্দা টেনে দিয়েছেন। এদিক বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টি উদ্‌ঘাটিত হয় তা হলো এ কাব্যগ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন কিছু দৃশ্যের অবতারণা ঘটিয়েছেন যা একটি প্রণয়োপাখ্যানকে স্বার্থকতার উঁচু স্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

লাইলী ওয়া মাজনূন (ليلى و مجنون)

'লাইলী ওয়া মাজনূন' কবি নিজামি গাঞ্জুবির বিখ্যাত প্রণয়োপাখ্যান। আরব্য এ রোমান্টিক প্রেমকাহিনীকে কাব্যাকারে উপস্থাপন করে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন কবি। কবি তাঁর এই রোমান্টিক কাব্যগ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তাঁর অকৃত্তিম ভালবাসার কথা তুলে ধরেছেন। কিন্তু এ কাব্যে যে ঘটনাটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে তা হলো লাইলী ও মাজনূনের প্রেমকাহিনী। এ কাব্যগ্রন্থটি রোমান্টিকতার সারিতে স্থান পেয়েছে মূলত এ কাহিনীর জন্যই। এখানে কবি কাহিনীকে কাব্যাকারে বর্ণনার পাশাপাশি রোমান্টিক যে দৃশ্যপটের অবতারণা করেছেন তা ফারসি সাহিত্যসহ বিশ্বসাহিত্য পরিমণ্ডলে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

'লাইলী ওয়া মাজনূন' প্রণয়োপাখ্যানের নায়ক মাজনূন আর নায়িকা হলো লাইলী। এ কাহিনী সমকালীন আরব বিশ্বে ছিল খুবই পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য। বর্তমানেও এর পরিচিতি রয়েছে বিশ্বব্যাপী। যেখানেই প্রণয়োপাখ্যানের কথা বলা হয়েছে সেখানেই 'লাইলী ওয়া মাজনূন' স্থান পেয়েছে শীর্ষে। এ কাব্যের মূল কাহিনী হলো লাইলী ও মাজনূনকে নিয়ে, যারা একে অপরকে ভালবাসত প্রাণের চেয়েও বেশি। প্রেমের পথ কোনো দিনই কণ্টকবিহীন ছিল না। যুগে যুগে যত প্রেমের ঘটনা ইতিহাসে স্থান পেয়েছে তার অধিকাংশেই ছিল পাহাড় পরিমাণ বাধার প্রাচীর। কেউ এ প্রাচীর অতিক্রম করে পান করতে পেরেছে স্বর্গীয় সুধা, আবার কেউ এ সুধার তৃষ্ণাকে বুকে ধারণ করেই পাড়ি জমিয়েছে পরপারে। প্রেমের প্রতি চিরন্তন এ

বাধা ছিল, আছে এবং থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। তারপরও প্রেম চির অমর, প্রেম চলবে তার আপন গতিতে। স্বর্গীয় এ অনুভূতিকে বাধা দিয়ে আটকে রাখা যায় না। সাময়িক এ বাধা সময়ের ব্যবধানে ভেঙে মিলন হয়েছে দু'জনের আর জয়ী হয়েছে প্রেম। কিন্তু 'লাইলী ওয়া মাজনূন' কাব্যে ইহজগতে তাদের মিলন না হলেও প্রেমের ইতিহাসে তারা হয়েছে অমর।

লাইলী ও মাজনূন যখন পরস্পরের প্রেমে পাগলপারা, স্বপ্নের জাল বুনছে একে অপরকে আপন করে পাওয়ার, ঠিক তখনই তাদের জীবনে আকস্মিক এক কালবোশেখির ঝড়ের ন্যায় বাধা হয়ে দাঁড়ান লাইলীর পিতা। কোনোভাবেই তিনি মেনে নিলেন না লাইলী ও মাজনূনের প্রেমকে। শুরু হলো বিরহের। শত চেষ্টার পরও যখন ব্যর্থ হলো লাইলীকে তার জীবনে আপন করে পাওয়ার সকল আকাঙ্ক্ষা, তখন মাজনূন প্রেমের বিরহে গৃহত্যাগ করল। উদাসীন হয়ে মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় আর মুখে জপতে থাকে লাইলীর নাম। তারপরও মনে তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যে, কোনো দিন হয়তো সে লাইলীকে তার জীবনে আপন করে পাবে। মানুষ আশা নিয়ে বেঁচে থাকে। আর দিগন্ত হতে এ আশার প্রতিধ্বনি শুনে মুগ্ধ হয় মানুষ। কিন্তু মাজনূনের এ আশা বাস্তবায়ন হয়নি কোনো দিন। এদিকে লাইলীও প্রণয়ীর জন্য বিমর্ষ থাকত সর্বদা। সহচরীদের শত আনন্দের মাঝেও উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আকাশের পানে। দিগন্তের ঐ মহাশূন্যে খুঁজে বেড়ায় মাজনূনকে। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! লাইলীর পিতা জোর করে তাকে মরু সর্দার ইবনে সালামের সাথে বিয়ে দেন। ইবনে সালামও লাইলীকে প্রচণ্ড ভালবাসত। কিন্তু এ ভালবাসা তার জীবনে সুখ বয়ে আনতে পারেনি। ইবনে সালামের ভালবাসার কথাও কবি তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন সুন্দরভাবে। ইবনে সালামের ভালবাসার কথা বলতে গিয়ে কবি নিজামি বলেন,

فهرست كش نشاط (بساط) اين باغ
برران سخن چنين كشد داغ
كانروز كه مه بباغ ميرفت
چون ماه دو هفته كرده هر هفت
گل بر سر سرو دسته بسته
بازار گلاب وگل شكسته
زلفش مسلسلش گره گير
پچيده چو حلقه هاى زنجير

'তার জীবনের আনন্দ এ বাগানে ভূলণ্ঠিত হয়েছে,
উরুর উপর তার ভালবাসার কথার চিত্রাঙ্কন করেছে।
ঐ দিন যেদিন চাঁদমুখী বাগানে গেল,
প্রতি সপ্তাহেই যেন তা দুই সপ্তাহের পরিণত চাঁদ ছিল।
সবুজ বৃক্ষের উপর এক শ্রেণির ফুল বিদ্যমান,
গোলাপ ও ফুলের বাগান ভেঙ্গেছে।
তার কোঁকড়ানো চুল ক্রমান্বয়ে গিরায় পরিণত হচ্ছে,
পেঁচিয়ে তা শিকলের ন্যায় গোল হয়ে যাচ্ছে।'

এদিকে মাজনূনের প্রণয় আত্মত্যাগের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। যে-ই শোনে সে-ই বিস্ময়ে আবেগ আপ্লুত হয়। আশেপাশের প্রত্যেকেই তাদের প্রতি মায়ায় উদগ্রীব হয়। ইতোমধ্যে অজানা এক পথিক মাজনূনকে শুনিয়ে গেল লাইলীর বিয়ের বৃত্তান্ত। দারুণ নৈরাশ্যে জীবন তার আচ্ছন্ন হয়ে গেল বিরহ নামক কষ্টের যন্ত্রণায়। দুঃখের সাগরে ভাসতে থাকল সে। মাজনূনের পিতা একাধিকবার তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনো ক্রমেই সে ফিরে এলো না। জগতের এ নিষ্ঠুর প্রকৃতির প্রতি ঘৃণা নিয়ে চলে গেল তেপান্তরে। আর এদিকে ভগ্ন হৃদয় নিয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন মাজনূনের পিতা। মাজনূনও চিরদিনের জন্য নির্দয় এ মানব সমাজের সংশ্রব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল আরও অনেক দূরে। একদিকে লাইলীকে না পাওয়ার বেদনা অন্যদিকে পিতার মৃত্যু, এদু'য়ের সমন্বয়ে মাজনূন যেন হয়ে গেল নিথর পাথরের ন্যায়। যেমনটি বলা হয়ে থাকে 'অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর'। মাজনূনের জীবনেও এ একই প্রবাদ বাস্তবায়ন হলো। এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ্য তা হলো কবি নিজামি গাঞ্জুবি তাঁর রোমান্টিক কাব্য রচনার ক্ষেত্রে এখানে অঙ্কন করেছেন দুঃখের এক চমৎকার দৃশ্যের। যা পাঠে পাঠক হৃদয় শিউরে উঠে আরেকবার। হৃদয় দিয়ে অনুভব করে এ করুণ দৃশ্যকে। বিনিময়ে সার্থক হন কবি তাঁর রোমান্টিক রচনার মাধ্যমে। যেমন মাজনূনের পিতার মৃত্যুর খবর বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেন,

چون مرد پدر ترابقاباد
آخر كم از آنكه آريش ياد
آيى بزيارتش زمانى
وارى (حوئى) ز تر حمش نشانى
در پوزش تربتش پناهى
عذرى ز روان او بخواهى
مجنون ز نواى آن كج آهنگ
ناليد و خميد راست چون چنگ
خود را ز دريغ برزمين زد
بسيار طپانچه بر جبين زد

'পিতা যেহেতু মৃত্যুবরণ করেছে, তুমি জীবিত থাক,
যা কিছু সুসজ্জিত করা হয়েছে, পরিণাম তার চেয়ে কম।
তুমি এসেছ এ সময়কে যিয়ারত করতে,
তুমি যেন সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ।
কষ্টগুলোকে সমাধিস্থ করেছ গোপনে,
তুমি গতিশীল আত্মার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও।
মাজনূন শোকের সুরে,
অসহায় অবস্থায় কাঁদতে লাগল।'

উপরিউক্ত কবিতায় নিজামি প্রেম-বিরহের এক করুণ দৃশ্য ও কাছের মানুষের বিয়োগ বেদনার যে আকুতি তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন নিঃসঙ্কোচে। আর নিজেকে উপস্থাপন করেছেন বিরহ রূপায়ণ চিত্রকর্মের এক শ্রেষ্ঠ চিত্রকর হিসেবে। এদিকে লাইলীও মাজনূনের বিরহ যন্ত্রণায় পাগল প্রায়। সারাক্ষণ মাজনূনের কথা ভেবে ভেবে নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম। তাই প্রেমের টানে লাইলী একদিন প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল মরুপ্রান্তরে প্রণয়ীর সন্ধানে। দু'জনই দু'জনকে খুঁজে বেড়ায় সেই ধু-ধু মরু বুকে। আর করুণাময়ের নিকট প্রার্থনা করে উভয়ের মিলনের জন্য। অত্যন্ত রোমান্টিক এ কামনার অভিব্যক্তিকে বর্ণনা

করেছেন কবি তাঁর কাব্যে। কবি বলেন,

آیا تو کجا وما کجائیم
تو زان که وما ترائیم
مائیم و نوای بینوائی
بسم اله اگر حریف مائی

'হে প্রভু, তুমি কোথায় আর আমরাই বা কোথায়,
তুমি যেখানেই থাক আমরা শুধু তোমারই।
আমরা আছি তোমার সুরেই, বিপরীতে নয়,
আমরা আছি করুণাময়ের আনুগত্যে, বিপরীতে নয়।'

অনেক খুঁজে খুঁজে দুঃখ-কষ্ট ও পথক্লেশ সহ্য করে শেষ পর্যন্ত লাইলী তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাজনূনের নিকট পৌঁছল। কিন্তু একি! মাজনূনের যে আর বাহ্যিক দৃষ্টি শক্তি নেই। সে নিজেকে সংবদ্ধ করে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা পুরো জগতকে লাইলীময় দেখছে। আর লাইলীর ভিতরের সেই অনন্ত সৌন্দর্যময় রূপের ঝলক নিরীক্ষণ করছে। লাইলী, তার প্রাণের লাইলী তাকে আদরে ডাকছে।

উদ্বেলিত অশ্রুধারা তাকে নিষিক্ত করছে। কিন্তু মাজনূন তন্ময় তার অন্তরলব্ধ চিন্ময়ের রূপধ্যানে। মাজনূন কোনোক্রমেই লাইলীকে চিনতে পারল না। আর এদৃশ্য কোনোক্রমেই লাইলী সহ্য করতে পারল না। পৃথিবীটা তার নিকট অর্থহীন মনে হলো। উপরোল্লিখিত দৃশ্যেও কবি চিত্রায়ন করেছেন রোমান্টিকতার এক অভূতপূর্ব দৃশ্যপট। একজন প্রেমিক তার প্রেয়সীর প্রেমে মগ্ন হয়ে জগৎসংসারের মায়া ভুলে তপস্যা করতে করতে নিজের দৃষ্টিশক্তিটাও হারিয়ে ফেলে। এই যে একটা চমৎকার দৃশ্যের আনয়ন, এ দ্বারাই কবি নিজামি গাঞ্জবির রোমান্টিক কাব্যের সার্থকতা ফুটে উঠেছে।

ভগ্নহৃদয় নিয়ে লাইলী নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করল। কিছু দিনের মধ্যেই মাজনূনের শোকে সেও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে। লাইলীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মাজনূন অত্যন্ত কষ্ট পায় এবং তার অন্তরে এ অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, ইহজগতে পাওয়ার মতো তার জন্য আর কোনোকিছুই অবশিষ্ট থাকল না। মাজনূনের এ রোমান্টিক প্রেমানুভূতিকে কবি কাব্যাকারে তুলে ধরেছেন নিজের মতো করে। কবি বলেন,

کز حادثه وفات آنماه
چون قیس شکسته دل شد آگاه
گریان شد وتلخ تلخ بگریست
بی گریه تلخ در جهان چیست

'যখন ঐ চাঁদমুখীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটল,
কায়েসের ভাঙ্গা হৃদয় যেন জাগ্রত হলো।
কষ্ট ও তিক্ততার সাথে ক্রন্দন করল,
তিক্ততার কান্না ব্যতীত এ জগতে আছেই বা আর কি।'

যার তপস্যায় জীবন কাটিয়ে দিল তাকে পাওয়ার পরিবর্তে সংবাদ এলো তার চির বিদায়ের। এ যেন এক অসহনীয় যন্ত্রণার দৃশ্যপট। যাকে কাব্যাকারে চিত্রায়িত করে কবি নিজামি আরেকবার সার্থক রোমান্টিক কাব্য হিসেবে প্রমাণ করলেন 'লাইলী ওয়া মাজনূন' কাব্যগ্রন্থকে।

লাইলীর মৃত্যু সংবাদ শুনে মাজনূন মানসিক ও শারীরিক উভয় দিক থেকেই ভেঙ্গে পড়ে। হারিয়ে ফেলে মানসিক ভারসাম্য। এভাবে ক্রমে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও স্বাস্থহানির ফলে মাজনূনও মৃত্যুবরণ করে। তার মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসার পর উভয় পরিবারের সম্মতিক্রমে একই কবরে তাদেরকে সমাহিত করা হয়। এ পর্যায়ে বিয়োগান্তক এ ব্যথার চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি নিজেই কষ্টে অস্বস্তিবোধ করেছিলেন। তাই এ কাহিনীর শেষান্তে এসে লাইলী ও মাজনূনের স্বর্গপুরীতে বিয়ে ও মিলন দেখিয়ে এ অপূর্ব রোমান্টিক কাব্যের পরিসমাপ্তি টানেন। যেমন এ প্রসঙ্গে কবি বলেন,

چون گشت بعالم این سخن فاش
افتاد ورق بدست او باش
کز غایت عشق دلستانی
شد شیفته نازنین جوانی

'যখন এ কথা সারা জগতে প্রকাশিত হলো,
বৃক্ষপত্র পতিত হলো তার হাতে।
প্রেমের শেষ পরিণতি হয়েছিল হৃদয়ের বন্ধন,
লাবণ্যময়ী প্রেয়সির প্রতি সে হয়েছে আসক্ত।'
(চলমান)

লেখক : প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নজরুল-সাহিত্যে ফারসির প্রভাব

ড. হোসনে আরা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম নামটির সঙ্গে 'বিদ্রোহী' অভিধাটি অচ্ছেদ্য হয়ে আছে। অসঙ্কোচে নিজ ভাবনাকে প্রকাশের দুরন্ত স্পর্ধায় বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯–১৯৭১) আবির্ভাব বিশ শতকের প্রথমার্ধে। রবীন্দ্র প্রভাব কাটিয়ে নিজস্ব ঔজ্জ্বল্যে প্রভাময় হয়ে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র মাত্রা সৃষ্টি করেছেন গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ এবং গান–সাহিত্যের সকল শাখায়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নজরুলই প্রথম সাহিত্যিক, যিনি ইউরোপকেন্দ্রিক সাহিত্যধারায় আপ্লুত না হয়ে এশিয়াকেন্দ্রিক সাহিত্যধারাকে মিলিয়ে দিয়েছেন বাংলা কাব্য ও কথাসাহিত্যের জগতের সঙ্গে। নজরুল অবশ্যই রোমান্টিক কবি, তবে তাঁর রোমান্টিকতা বিশুদ্ধ পশ্চিমা নয়, বরং অনেক বেশি প্রাচ্য বা এশীয়। তবে এটা ভাবা একবারেই ভুল হবে যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে নজরুলের সংযোগের অভাবে বা পশ্চিমা সাহিত্যে তাঁর দখল না থাকার কারণেই এমনটা ঘটেছে। তাঁর রচিত 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে বিশ্বসাহিত্যের বহু সাহিত্যিকের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে পশ্চিমা সাহিত্যের সঙ্গে নজরুলের জানাশোনা নেই, এ কথাটি অবান্তর প্রতীয়মান হয়।

পশ্চিমা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও নজরুল-সাহিত্যে ইউরোপের-প্রভাব যতটা প্রত্যক্ষ তার চাইতে বেশি প্রভাব দেখা যায় এশিয়া তথা পারস্যের। সৈয়দ মুজতবা আলী ইরানকে কবির 'দ্বিতীয় মাতৃভূমি' বলে অভিহিত করেছেন।[১] মূলত ইরানি ও ভারতীয় একই আর্যগোষ্ঠীর দুই শাখা। তাই চিরদিনই ভারত ও পারস্যের আত্মা সমসূত্রে গ্রথিত (এনামুল ১৯৯১: ৯৪)। প্রাচীন পারস্য একাধিকবার গ্রিকদের সঙ্গে সংঘর্ষে কখনও পরাজিত এবং কখনও জয়ী হয়েছে এবং একসময় মিশর, প্যালেস্টাইন অধিকার করেছে, এমনটি গ্রিসে পর্যন্ত হানা দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে আরবের কাছে পরাজিত হয়ে ইরান বিজিত জাতির ধর্মকে গ্রহণ করেছিল ইসলামের উদার-নৈতিক মনোভাবকে ভালোবেসে। আরবি রাজভাষা হবার প্রায় চারশ বছর পরে ফেরদৌসীর ফারসি ভাষায় লিখিত মহাকাব্য 'শাহনামা'তে প্রাক্-মুসলিম যুগের ইরানি যোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনীর মধ্য দিয়ে স্বাজাত্যবোধের যে উন্মেষ ঘটেছিল তার ধারাবাহিকতা দেখা যায় একাদশ-দ্বাদশ শতকের ফারসি সাহিত্যে। নতুন পারস্যের স্বদেশ ও স্বজাতির গর্বে গরীয়ান কবিরা কাব্যের সর্ব বিষয়বস্তু নিয়ে নব নব যে কাব্যধারার প্রবর্তন করলেন তার কাছে পরবর্তী যুগের ইউরোপীয় রেনেসাঁও এতখানি সর্বমুখী বলে মনে হয় না। বিশ্বের কাব্যজগতে ইরান একসময় অদ্বিতীয় আসন সৃষ্টি করেছিল। এ বিষয়টিই সম্ভবত উপনিবেশ শৃঙ্খলিত নজরুলকে আকৃষ্ট করেছিল। ইরানিরা যেমন আরবি ভাষার উপনিবেশিকতাকে পরিত্যাগ করে স্বাজাত্যবোধের আস্ফালনে দিগন্ত মুখরিত করেছে, তেমনি নজরুল-মানসও উদ্বেল হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধিতায়। নজরুলের মধ্যে এ বিদ্রোহ ছিল সুস্পষ্ট, দৃশ্যমান ও তীব্র এবং এ মানসিকতায় ফারসি কবি ও কাব্যের প্রভাব যথেষ্ট বলে ধারণা করা অসঙ্গত হবে না। বিদ্রোহ-চেতনা কেবল নয়, প্রেম ও বিরহের দৃশ্যপট সৃজনেও এ প্রভাব কার্যকর ছিল প্রবলভাবে। নজরুল সাহিত্যে ফারসির প্রভাবকে দুই ধাপে দেখানোর চেষ্টা করা হবে আলোচ্য প্রবন্ধে–

প্রথমত, নজরুলের সাহিত্যিক-জীবনের উন্মেষকালে ফারসি সাহিত্যের প্রভাব।

দ্বিতীয়ত, নজরুল-সাহিত্যে ভাব ও ভাষায় ফারসির প্রভাব।

কৈশোর-উত্তীর্ণ নজরুল ১৯১৭-এর শেষের দিকে প্রি-টেস্ট পরীক্ষা দেওয়ার পর শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটিয়ে যোগ দেন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাঙালি হিন্দু মুসলমান তরুণ দিয়ে গড়া '৪৯ নম্বর বাঙালি রেজিমেন্টের' একজন সেনা হয়ে করাচি সেনানিবাসে নজরুল কাটান তাঁর সেনাজীবন (১৯১৭-মার্চ, ১৯২০)। বোহেমিয়ান নজরুল কেবল খেয়ালের বশে বা চাকুরির লোভে নয়, বরং সেনাবাহিনীতে থেকে যুদ্ধের কলাকৌশল শিক্ষা, অস্ত্রচালনার সামর্থ্য অর্জন ইত্যাদি দক্ষতাকে শেষ পর্যন্ত ইংরেজবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত করার বাসনায় যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। রানিগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ স্কুলে পড়ার সময় ঐ স্কুলের শিক্ষক যুগান্তর দলের কর্মী (ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের গুপ্ত দল) নিবারণচন্দ্র ঘটকের সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। নজরুলের 'কুহেলিকা' উপন্যাসে বিপ্লবী শিক্ষক প্রমত্ত চরিত্রে নিবারণচন্দ্রের ছায়াপাত ঘটেছে বলে মনে করা হয় (অরুণ, ২০১৯; ২৬)। নজরুল-মননে ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধিতা এবং মাতৃভূমির প্রতি গভীর আবেগের প্রকাশ তাঁর এসময়ে রচিত

কবিতায়ও পাওয়া যায় –

ঐ গাঁয়ের দখিনে দাঁড়ায়ে কে তুমি যুগ যুগ ধরি একা গো?
তোমার বুকে ও কিসের মলিন রেখা গো?
এ কোন দেশের ভগ্নাবশেষ?
কোন দিদিমার কাহিনির দেশ?

'ভগ্নস্তূপ' নামক এ কবিতাটির রচনাকাল ১৯১৭ বলে মনে করেন নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (অরুণ, ২০১৯; ১৭)। অর্থাৎ সৈনিক জীবনের পূর্বেই নজরুল-মানসে স্বাদেশিকতার বোধটি সুস্পষ্ট ছিল। ঠিক এই সময়ে নজরুলের এই বিপ্লবাত্মক চেতনা ফারসি সাহিত্যের সংস্পর্শে লাভ করে নতুন মাত্রা।

করাচি সেনাশিবিরে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে এক পাঞ্জাবি মৌলবির সঙ্গে; যাঁর কাছে থেকে তিনি দীক্ষা নেন ফারসি সাহিত্যের। এ প্রসঙ্গে রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ গ্রন্থের মুখবন্ধে দেওয়া নজরুলের নিজের বক্তব্য–

আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন পাঞ্জাবি মৌলবী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি (রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৯৯৬; ১৫)।

করাচি সেনাশিবিরে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে এক পাঞ্জাবি মৌলবির সঙ্গে; যাঁর কাছে থেকে তিনি দীক্ষা নেন ফারসি সাহিত্যের। এ প্রসঙ্গে রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ গ্রন্থের মুখবন্ধে দেওয়া নজরুলের নিজের বক্তব্য–

আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন পাঞ্জাবি মৌলবী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি (রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৯৯৬; ১৫)।

নজরুলের ফারসি ভাষাশিক্ষার সূত্রপাত সম্ভবত তাঁর বাল্যকালে পারিবারিক পরিবেশে। তখনকার গ্রাম্য মক্তবেও আরবির সঙ্গে সঙ্গে ফারসির প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পরবর্তী সময়ে স্কুল-জীবনে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিশোর নজরুলের ফারসি শেখার সুযোগ ঘটে রানিগঞ্জ শিয়ারসোল হাই স্কুলে পাঠকালে হাফিজ নুরুন্নবীর কাছে থেকে (অরুণকুমার ২০১৯; ২৫)। করাচিতে মৌলবির কাছে থেকে শেখা ফারসি সম্ভবত কাব্যভাষা।

করাচি অবস্থানকালেই নজরুলের সাহিত্যিক-জীবনের সূচনা ঘটে এ তথ্য সকলের জানা। এ সময়ে ফারসি-সাহিত্যের সংস্পর্শে নজরুলের মানসজগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তারও সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে তাঁর প্রারম্ভিক জীবনের সাহিত্যে।

অগ্নি-বীণা (কার্তিক ১৩২৯, ২৫ অক্টোবর ১৯২২) প্রকাশের পূর্বেই নজরুলের গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' (ফাল্গুন ১৩২৮, ফেব্রুয়ারি ১৯২২) প্রকাশিত হয়; এটি তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। এ গ্রন্থের নামগল্প 'ব্যথার দান' এর স্থানিক পটভূমি গোলেস্তান, বোস্তান প্রমুখ স্থানের উল্লেখ রয়েছে। 'গোলেস্তান' ইরানের ৩১টি প্রদেশের একটি, এটি ইরানের উত্তর-পূর্বে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত। 'বোস্তান' ইরানের খুজেস্তান প্রদেশের দাশত-ই-আজাদেগান কাউন্টির একটি শহর। নজরুল সশরীরে কখনও এসব স্থানে যাননি কিন্তু 'ব্যথার দান' গল্পের নায়ক-নায়িকা দারা ও বিদৌরাকে নির্মাণ করেছেন এ দুটি স্থানের পটভূমিতে। হয়তো যে প্রণয়-কাহিনী তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন তাতে বাঙালি নারী-চরিত্র খাপ-খাওয়াতে পারেননি; অথবা হয়তো আঙুর-নাশপাতি বাগান-শোভিত, পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত, ঝরনা-বাহিত কল্পনার রাজ্যে পাঠককে অবগাহিত করতে চেয়েছিলেন। কারণ যাই হোক না কেন স্থান-নির্বাচনে ইরানকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয়। আরও লক্ষণীয় স্থানের নামদুটি শেখ সাদির বিখ্যাত দুটি গ্রন্থের অনুরূপ। ফারসি কবিপ্রতিভা শেখ সাদি (১২০৯-১২৯১)-র কালজয়ী সৃষ্টিকর্ম 'গোলেস্তান' ও 'বোস্তান' (কামাল ২০২৩; ৩৪)। তবে শেখ সাদির সৃষ্টিকর্মকে গ্রহণ করেছেন নজরুল ভাব হিসেবে, তাঁর সাহিত্য অনুবাদে নজরুল তৎপর ছিলেন না। বরং নজরুল মগ্ন ছিলেন হাফিজ ও খৈয়ামের সাহিত্যে।

'ব্যথার দান' গল্পে নায়ক দারার জবানিতে একাধিকবার পারসিক কবি হাফিজ (শিরাজ-বুলবুল বলে অভিহিত) ও তাঁর কবিতার উল্লেখ আছে–

১. শিরাজ-বুলবুল্-এর 'দিওয়ান' পাশে থুয়ে আমি তোমার অবাধ্য চুলগুলো সংযত করে দিচ্ছিলাম (রচনাবলী ১, ১৯৯৬; ৬০৫)।

২. আমি শিরাজের বুলবুলের সেই গানটি আবৃত্তি করেছিলাম–

'দেখনু সে-দিন ফুল-বাগিচায় ফাগুন মাসের উষায়,
সদ্য ফোটা পদ্ম ফুলের লুটিয়ে পরাগ-ভূষায়
(রচনাবলী ১, ১৯৯৬; ৬০৫)।

৩. ইরানের পাগলা কবিদের 'দিওয়ান' প'ড়ে প'ড়ে আমিও পাগল হ'য়ে গিয়েছি (রচনাবলী ১, ১৯৯৬; ৬০৫)।

১৩২৬-এর পৌষ মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় নজরুল কর্তৃক হাফিজের একটি দীওয়ানের অনূদিত রূপ 'আশায়' প্রকাশিত হয়। এ কবিতাটি ছাপানোয় সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (সহকারী সম্পাদক, সবুজপত্র)-কে লেখা এক চিঠিতে নজরুল তাঁর হাফিজ-মুগ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে–

পারসিক কবি হাফিজের মধ্যে বাঙলার সবুজ দূর্বা ও জুঁই ফুলের সুবাস আর প্রিয়ার চূর্ণ কুন্তলের যে মৃদু গন্ধের সন্ধান আমি পেয়েছি, সে-সবই ত খাঁটি বাঙলার কথা, বাঙালী জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আনন্দরসের পরিপূর্ণ সমাহার। কত শত বছর আগের পারস্যের কবি, আর কোথায় আজকের সদ্য শিশির-ভেজা সবুজ বাঙ্গলা। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের রুক্ষ পরিবেশে মৃত্যুসমারোহের মধ্যে বসে এই যে চিরন্তন প্রেমিক-মনের সমভাব আমি চাক্ষুষ করলাম আমার ভাষায়, আমার আপনজন বাঙালিকে সেই কথা জানাবার আকুল আগ্রহই এই এক টুকরো কবিতা হয়ে ফুটে বেরিয়েছে (রচনাবলী ৪, ১৯৯৬; ৩৬৬)।

পারস্য ও বাংলাকে মিলিয়ে দেবার তাড়নায় পারসিক কবি

হাফিজের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানও নজরুলের গল্পে সন্নিবেশিত হয়। 'ব্যথার দান' গল্পের দারা ও বিদৌরার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে তিনটি রবীন্দ্র-গান; 'মম বিজন-বিহারী', 'আমার পরান যাহা চায়', 'আমার সকল দুখের প্রদীপ'। সংগীতপ্রিয় নজরুল অজস্র গান জানতেন, গাইতেন; নিজের লেখা গান ছাড়াও। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গান বিশেষভাবে উল্লেখ্য। রানিগঞ্জে ছাত্রজীবনেই হয়তো তাঁর রবীন্দ্র গান আয়ত্ত হওয়ার সূচনা, করাচির সৈনিক জীবনে তিনি রীতিমতো স্বরলিপি আনিয়ে রবীন্দ্রগানের চর্চা করেছেন বলে শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথের এতো বেশি গান নজরুল স্মরণে রেখে গাইতে পারতেন যে, তাঁর বন্ধু মুজফফর আহমদ বলতেন, 'নজরুল রবীন্দ্রসংগীতের হাফিজ' (অরুণ, ২০১৯; ৪৮)। অর্থাৎ সাহিত্যিক-জীবনের উন্মেষকালে নজরুল ইরান ও বাংলার কবিদের দ্বারা প্রাণিত হয়েছিলেন সমভাবে।

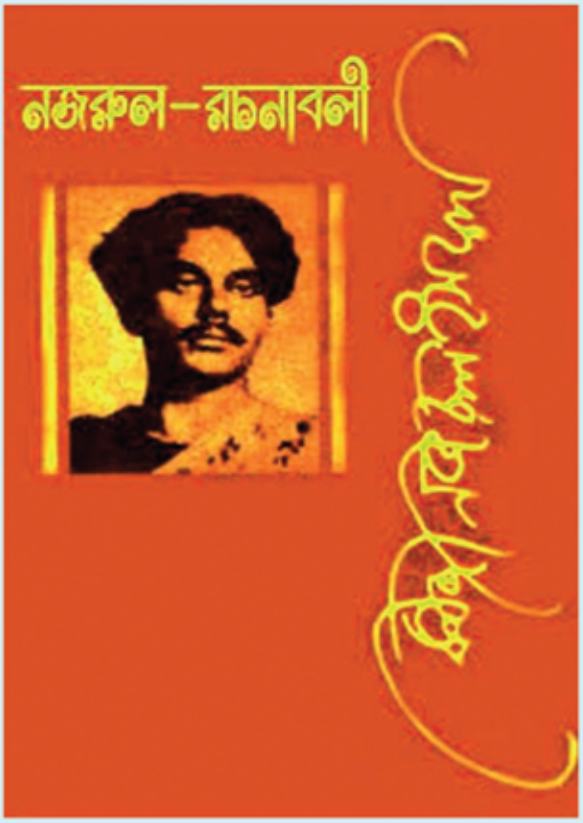

উন্মেষকালে যেমন পরবর্তী সাহিত্যিক-জীবনের ভাব-গঠনেও ফারসির প্রভাব কার্যকর ছিল। নজরুলের ঔপনিবেশিক-বিদ্রোহী সত্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে ফারসি কবিদের দ্বারা প্রভাবিত। ১৩৩৪ সালের ভাদ্র সংখ্যায় নওরোজ পত্রিকায় কাজী নজরুল ইসলামকে লেখা প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর প্রকাশিত এক পত্রের উত্তর ১৩৩৪ সালের সওগাত পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় নজরুল প্রকাশ করেছিলেন। সুদীর্ঘ এই পত্রে নজরুল সুস্পষ্টভাবে বলেছেন–

আমার 'বিদ্রোহী' পড়ে যাঁরা আমার উপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, তাঁরা যে, হাফেজ-রুমীকে শ্রদ্ধা করেন – এ-ও আমার মনে হয় না। আমি ত আমার চেয়েও বিদ্রোহী মনে করি তাঁদেরে (রচনাবলী ৪, ১৯৯৬; ৪০০)।

পারস্যের কবিরা বিশেষত হাফিজ ও ওমর যেমন নিজ সময়ের অন্ধ রীতিনীতিকে পাশ কাটিয়ে আলোকের সন্ধানে ব্যাপৃত থেকেছেন, নজরুলও তেমনি নিজ কাল বা জনমত নয়, নিজের মনের আলোকে পৃথিবী দেখার চেষ্টা করেছেন। এমনকি নজরুল মানসে সাম্যবাদের মূল সুর যেন ফারসি কবি রুমি খৈয়াম ও হাফিজের কাব্যরসেরই আধুনিক ভাষ্য (কামাল ২০২৩; ৩২)।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেনাজীবন বেছে নেওয়ার পেছনে নজরুলের স্বাদেশিকতা ও বিপ্লবী চেতনা কার্যকর ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বাঙালি রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়ায় নজরুল ফিরে আসেন কলকাতায়। উল্লেখ্য যে, রেজিমেন্ট ভাঙা আরও দু-চারজন প্রাক্তন সৈনিক দেশে ফিরে বিপ্লবী কর্মকলাপের সঙ্গে ক্রমশ যুক্ত হয়ে পড়েন। পরবর্তী সময়ে নজরুলের সঙ্গেও তাঁদের অনেকের যোগাযোগ অক্ষুণ্ন ছিল (অরুণ ২০১৯; ৪১)। এ ধারণা করা অমূলক হবে না যে, করাচি জীবনে ফারসি সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় যোগ না ঘটলে নজরুল হয়তো সাহিত্যক্ষেত্রে বিদ্রোহের বাণী উচ্চারণ না করে অস্ত্র হাতে রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হতেন – অন্তত সেই সম্ভাবনা ছিল। ফারসি সাহিত্যের সংস্পর্শে নজরুল-জীবনে বাঁক-বদল ঘটেছিল, আপাতদৃষ্টিতে তেমন মনে হওয়ার যুক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী।

১৩২৬-এ প্রবাসীতে 'আশায়' কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর ১৩২৭ সালের আষাঢ় মাসে মোসলেম ভারত পত্রিকায় নজরুল কর্তৃক হাফিজের আরেকটি দীওয়ানের অনূদিত রূপ 'বাদলপ্রাতের শরাব' প্রকাশিত হয়। এসময় একাধারে হাফিজের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি দীওয়ান বা গজল অনুবাদ করেন কবি। কিন্তু এরপর কিছুটা একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হয়ে, কিছুটা ধৈর্য হারিয়ে হাফিজ অনুবাদের কাজ বন্ধ করে দেন। অনুবাদ ছাড়াও হাফিজের 'জুলকে আ-শফতা ও থুয়ে জর্দা ও যান্দানে লবেমস্ত' গজলের ভাবাবলম্বনে রচনা করেন 'প্রিয়ার দেয়া শরাব'। হাফিজ তাঁকে এতোই অভিভূত করেছিল যে, হাফিজের মানসী প্রিয়ার নামে তিনি কবিতা রচনা করেন 'শাখ্-ই-নবাত্'। শুধু তাই নয়, প্রিয় পুত্রের নামকরণও তিনি করেন শিরাজের বুলবুলের নামে। সেই পুত্র বুলবুলের মৃত্যু-শিয়রে বসে কবি এ অনুবাদ করেন 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'। কাব্যানুবাদের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কবিপুত্রের জীবনাবসান ঘটে। এ অসহনীয় শোককে ধারণ করে কবি এ কাব্যটি উৎসর্গ করেছেন বুলবুলকে এবং কাব্যের মুখবন্ধে এ মৃত্যুকে ত্যাগ বলে অভিহিত করেছেন – যেদিন অনুবাদ শেষ হল, সেদিন আমার খোকা বুলবুল চলে গেছে।

আমার জীবনের যে ছিল প্রিয়তম, যা ছিল শ্রেয়তম তারই নজরানা দিয়ে শিরাজের বুলবুল কবিকে বাঙলায় আমন্ত্রণ করে আনলাম।

বাঙলার শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দিনের আমন্ত্রণকে ইরানের কবি-সম্রাট হাফিজ উপেক্ষা করেছিলেন। আমার আহ্বান উপেক্ষিত হয়নি। যে পথ দিয়ে আমার পুত্রের 'জানাজা' (শবযান) চলে গেল, সেই পথ দিয়ে আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তম ইরানী কবি আমার দ্বারে এলেন। আমার চোখের জলে তাঁর চরণ অভিষিক্ত হল (রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৯৯৬; ১৫)।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হাফিজের গুণমুগ্ধ সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ কবিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বাংলায় পরম সমাদরে। কবিও তাঁর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেননি, সমুদ্রপথে যাত্রা করেছিলেন ভারতের উদ্দেশ্যে, কিন্তু পথিমধ্যে প্রবল ঝড়-তুফান

বাধ সাধে তাঁর এই সদিচ্ছায়। সমুদ্র-ভ্রমণের অভিজ্ঞতাহীন হাফিজ প্রাণভয়ে ভীত হন এবং তাঁর মনে হয় যে, স্রষ্টার সম্ভবত অনুমোদন নেই এই যাত্রায়। শেষ জীবনেও তিনি ভারত-ভ্রমণে ইচ্ছুক হয়েছেন, কিন্তু শরীরের অশক্ত অবস্থা সেই পরিকল্পনাকে অনুমোদন দেয়নি।

প্রথম জীবনে হাফিজের দীওয়ান-এর ভাবে আচ্ছন্ন নজরুল প্রেম ও বিরহের ভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে রুবাইয়াৎ-এ হাফিজের দার্শনিক সত্তাতে অবগাহন করেছেন। সাহিত্যিক নজরুলের উন্মেষকালে কবি হাফিজ তাঁকে এতখানি আপ্লুত করেছিল যে, কেবল কবিতায় নয়, গল্পেও তিনি হাফিজকে এনেছেন চরিত্র হিসেবে, হাফিজের আধ্যাত্মিকতা নিয়ে প্রচলিত কাহিনী অনুসরণে রচনা করেছেন 'সালেক' নামক ছোটগল্প, 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থে যা গ্রথিত হয়েছে। চার পরিচ্ছেদের এই ছোটগল্পে কবি নয়, দরবেশরূপী হাফিজকে চিত্রিত করা হয়েছে। হাফিজ নিজেকে রিন্দা বা মুসলমান ফকির বলে ঘোষণা করেছিলেন (বরকতুল্লাহ ১৯৯৪; ৮০)। রিন্দারা বাহ্যিক ধর্মাচারের যে সকল বিধি-নিষেধ সমাজে প্রচলিত, সেগুলো মানতেন না। হাফিজ নিজেকে রিন্দা বললেও জীবন-যাপনে উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন না; বরং আজীবন কঠোর সাধনায় চরিত্রকে সমুন্নত রেখেছেন। তাঁর অলৌকিকতা নিয়ে বহু গল্প প্রচলিত রয়েছে। কবি জামী তাঁর 'সুফীদিগের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে হাফিজকে 'লেছানেল গায়েব' অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বক্তা বলে অভিহিত করেছেন (বরকতুল্লাহ ১৯৯৪; ৮০)। 'সালেক' গল্পটি সেই ভাবধারাতেই রচিত। তবে ভাষা নিজের হলেও এ কাহিনী-রেখা হাফিজেরই এক দীওয়ান থেকে সংগৃহীত। হাফিজের একটি দীওয়ানের অংশ –

বা মায় ছাজ্জাদা রঙ্গীন কোন
গারাৎ পীরে মোগাঁ গোইয়াদ
কে ছালেক বেখবর না বুয়াদ
যে রাহ ও রেছমে মনজেলহা। (রচনাবলী ৩, ১৯৯৬; ৭৮)

অর্থাৎ, পীর যদি বলেন, জায়নামাজ মদিরাসিক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইও না। কেননা পথ ও পথের রেওয়াজ সম্বন্ধে তিনি অনবধান নহেন। (বরকতুল্লাহ ১৯৯৪: ৭৮)

'সালেক' গল্পটি এই ভাবকে সম্প্রসারিত করে কাহিনীতে রূপ পেয়েছে।

হাফিজ কোনও সম্প্রদায় মানতেন না, কোনও সাম্প্রদায়িক নিয়মের তোয়াক্কা করতেন না। এ ভাবধারার চরম প্রকাশ তো আমরা নজরুলে পাই স্পষ্টভাবেই; 'বিদ্রোহী' কবিতায় যার প্রকাশ ঘটেছে এভাবে–

আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানি না কো কোন আইন,

হাফিজের দীওয়ানে মুগ্ধ ছিলেন নজরুল, অনুবাদও করেছেন কিছু বিচ্ছিন্নভাবে, তবে সমগ্রতার দিক থেকে তিনি অবলম্বন করেছেন রুবাইয়াৎ-কে। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন –

তাঁর রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী কবিতাগুলি পড়ে মনে হয়, এ যেন তাঁর অবসর সময় কাটানোর জন্যই লেখা। অবশ্য এতেও তাঁর সেই দর্শন, সেই প্রেম, সেই শারাব-সাকি তেমনিভাবেই জড়িয়ে আছে।

এ যেন তাঁর অতল সমুদ্রের বুদ্বুদ-কণা। তবে এ ক্ষুদ্র বিম্ব হলেও এতে সারা আকাশের গ্রহ-তারার প্রতিবিম্ব প'ড়ে একে রামধনুর কণার মত রাঙিয়ে তুলেছে। হয়ত এত ছোট বলেই এ এত সুন্দর। (রচনাবলী-৩, ১৯৯৬; ১৫)

এ কারণেই চতুষ্পদী ফারসি এ কবিতাগুলো কবিকে আকৃষ্ট করেছিল সর্বাধিক। ভাব-বিন্যাস ও ছন্দ নির্মাণে যে নতুনত্ব, তাকে বাংলা কাব্যে যোগ করার স্পর্ধাতেই নজরুল রুবাইয়াৎ অনুবাদ করেছেন হাফিজের এবং ওমর-খৈয়ামের।

প্রথম জীবনে হাফিজে বুঁদ হয়ে থাকলেও পরবর্তী সময়ে নজরুল-মানসে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য বিস্তার করেছেন হাফিজের পূর্বসূরি আরেক পারস্য-কবি ওমর খৈয়াম (১০৪৮-১১২৩)। বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক, দার্শনিক ওমর কবিও বটে। ইংরেজ কবি-দার্শনিক ফিটজেরাল্ডের অনুবাদের (১৮৫৯) মাধ্যমে পুরো ইউরোপের মন জয় করেছেন ওমর কেবল ছন্দের লালিত্য ও শব্দবিন্যাসের মাধুর্যে নয়, তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যও।

বাংলা ভাষায় ওমরের প্রবেশ ফিটজেরাল্ডের কাব্যানুবাদের মাধ্যমে। ফিটজেরাল্ড ওমরের প্রথমাবস্থায় ৭৫টি রুবাই অনুবাদ করেন এবং পরবর্তী সময়ে ১১০টি, যদিও ওমরের নামে আড়াই হাজার রুবাই প্রচলিত রয়েছে। তার মধ্যে বিশেষজ্ঞের মতে হয়তো দুশ বা আড়াইশ টিকবে ওমরের নিজের লেখা বলে। বাংলার অনেক বিশিষ্ট কবি খৈয়ামের অনুবাদ করেছেন

আংশিকভাবে। তার ভেতর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রদেব, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ মুজতবা আলী, সিকান্দার আবু জাফর প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।

মূল ফারসি থেকে ওমরের ১৯৭টি রুবাই অনুবাদ করেন কাজী নজরুল ইসলাম। গ্রন্থাকারে নজরুলের 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' প্রকাশিত হয় ১৩৬৬ পৌষ অর্থাৎ ১৯৫৯ ডিসেম্বরে; কবি যখন নির্বাক হয়ে আছেন। গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন সৈয়দ মুজতবা আলী 'নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম' শিরোনামে। নজরুল নিজে আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল-রচনা-সম্ভার' পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে 'ওমরের কাব্য ও দর্শন' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন তা পরবর্তী সময়ে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত আবদুল

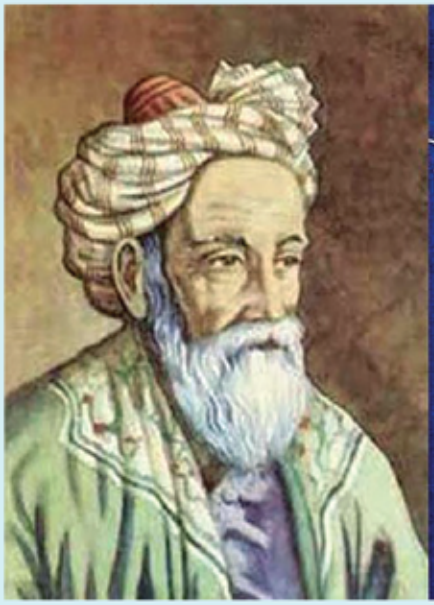

কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলী (১৯৭৭)-র ৩য় খণ্ডে 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' এর ভূমিকা হিসেবে স্থান পেয়েছে। এ রচনাটি 'এই সময়কার নজরুলের গভীর রসবোধ, কাব্যচেতনা, আরবি-ফারসির জ্ঞান, মধ্যপ্রাচ্য ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর কৌতূহল, এই সবকিছুর অতি বাস্তব দলিল (অরুণকুমার ২০১৯; ৪৯৬)।'

ওমর ভোগবাদী কবি নন, তিনি মূলত জীবনবাদী কবি। তাঁর কাব্যে শরাব-সাকির ছড়াছড়ি থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মদ্যপ ছিলেন কিনা তার প্রমাণ নেই; বরং জীবনে এবং কাব্যে তাঁর আশ্চর্য সংযমের পরিচয়ই লিপিবদ্ধ রয়েছে।

নজরুলের মতে, ওমর তাঁর রুবাইয়ে শারাব বলতে আঙুরের ক্বাথের উল্লেখ করেছেন, যা পারস্যের সকল কবিরই অন্তত 'বলার জন্য বলা'র বিলাস। শারাব, সাকি, গোলাপ, বুলবুলকে বাদ দিয়ে যে কবিতা লেখা যায়, তা ইরানের কবিরা ভাবতে অক্ষম ছিলেন।

নজরুল ওমরকে উপমিত করেছেন 'মরুভূমির বুকের খর্জুর তরু' হিসেবে; যার সারা দেহে কণ্টকের জ্বালা, উর্ধ্বে রৌদ্রতপ্ত আকাশ, নিম্নে আতপতপ্ত বালুকা – এর মধ্যে অবস্থান করেও এ বৃক্ষ সুমিষ্ট রসের নহর বইয়ে দেয়। ওমর তেমনি শত লাঞ্ছনা ভোগ করেও কাব্যরসে সিক্ত করেছেন ধরার অন্তর। সমকালে এ কবির যথার্থ মূল্যায়ন তো হয়-ই-নি, উল্টো 'কাফের' অভিধায় অভিষিক্ত হতে হয়েছে। তিনি যুগের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন বলেই সমকাল তাকে ভুল বুঝেছে। নজরুলের ভাষায় –

ওমরকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল, তা বুঝি তাঁর ঐ হাজার বছর আগে জন্মাবার জন্যই। আজকাল পুথিবীর কোনো মডার্ন কবিই তাঁর মতো মডার্ন নন, তরুণও নন। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানপ্রবৃদ্ধ লোকও তাঁর সব মত বুঝি হজম করতে পারেন না। ওমর আজ জগতে অপরিমাণ শ্রদ্ধা পাচ্ছেন – তবু মনে হয়, আরো চার পাঁচ শতাব্দী পরে তিনি আরো বেশি শ্রদ্ধা পাবেন – যা পেয়েছেন তার বহু সহস্র গুণ।... (রচনাবলী ২, ১৯৯৬; ১০৪-১০৫)

নজরুল যেমন প্রচলিত মতকে অনুসরণ করে ওমরকে আংশিক Epicurean বলে মেনে নিতে দ্বিধা করেননি, তেমনি ওমরকে সুফি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কিনা তা নিয়েও কিছুটা উদাসীন ছিলেন। ইরানের কবিদের মধ্যে সুফিবাদের প্রভাব কমবেশি ছিলই এবং শারাব-সাকিকে তাঁরা মূলত রূপকার্থে ব্যবহার করে সাধনার পথকে গোপন রাখেন। ওমরের দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে নজরুলের মাথাব্যথা ছিল না, তিনি নিজেকে তত্ত্বজিজ্ঞাসু নয়, রস-পিপাসু বলে অভিহিত করে ওমরের কবিতা নিয়েই আনন্দে ছিলেন। ওমরের প্রবল রসবোধেও প্রভাবিত হয়েছেন নজরুল। নজরুল-সাহিত্যের অনেক জায়গায় কৌতুক রসের প্রাধান্য দেখা যায়।

এটা সত্য যে, ওমরের মধ্যে প্রত্যক্ষবাদিতার সুর স্পষ্ট। জগৎ-সংসার নিয়ে তাঁর জিজ্ঞাস্য ছিল, অনাস্থা ছিল, কিন্তু এপিকিউরিয়াস ও চার্বাকপন্থীদের মতো ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস বা নাস্তিকতা ছিল না। বরং শেষ জীবনে ওমর ধর্মচর্চা করেছেন বলেই শোনা যায় (বরকতুল্লাহ ১৯৯৪: ৩৭)। তাঁর রুবাইয়ের কোন কোন স্থলে স্রষ্টার প্রতি নির্ভরতা প্রকাশ পেয়েছে –

১৫১ নং রুবাইয়ে মানুষকে স্রষ্টার খেলার পুতুল বলে অভিহিত করা হয়েছে –

আসিনি ত হেথায় আমি আপন স্বাধীন ইচ্ছাতে,
যাবও না নিজ ইচ্ছামত, খেলার পুতুল তাঁর হাতে!

অথবা ১৬১ নং রুবাই উল্লেখ করা যায় –

আমরা দাবাখেলার ঘুঁটি, নাইরে এতে সন্দ নাই!
আসমানী সেই রাজ-দাবাড়ে চালায় যেমন চলছি তাই। (নজরুল ১৯৮৯-৯০)

নজরুল তাঁর নিজ গানেও এ ভাবকে অনুসরণ করে রচনা করেছেন– 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে।'

ওমরের মধ্যে বা তাঁর রুবাইয়াতে অংশত সুফিবাদ, চার্বাকদর্শন বা ভোগবাদ থাকলেও তিনি যে নাস্তিক ছিলেন না– তা জোর দিয়ে বলা যায়। মূলত ধর্ম-বিষয়ক দর্শনে তাঁর মধ্যে যে রহস্যময়তা রয়েছে, তা আসলে বিদ্রোহের স্পর্শে স্পর্ধিত। তিনি নিজেই নতুন এক মতবাদের উদ্গাতা। ওমরের সঙ্গে নজরুলের তাই সাজুয্য পাওয়া যায় ধর্ম-দর্শনেও। নজরুল একাধারে হামদ-নাত লিখেছেন, অন্যদিকে রচনা করেছেন বহু সংখ্যক শ্যামা-সঙ্গীত, হিন্দু-মুসলিম দুই ধর্মাবলম্বীদের মিলনের কামনায় উভয় ধর্মের পুরাণ ও ঐতিহ্যকে মিলিয়ে দিয়েছেন কাব্যের আধারে। ওমরের মতো নজরুলও জীবনবাদী; প্রবল জীবনবোধে উজ্জীবিত হয়ে প্রথাগত কূপমণ্ডূক ধর্মাচারকে উড়িয়ে দিয়ে তিনি মানুষের তথা জীবনের গান গেয়েছেন। সমকালে তাই ওমরের মতোই 'কাফের' আখ্যা দেওয়া হয়েছে তাঁকে, ওমরের মতোই দুর্বোধ্য ছিলেন তিনি; প্রথাগত সমাজ-জীবনের গণ্ডিতে তাই তাঁকে খাপ খাওয়ানো যায়নি। ওমরের মতোই নজরুলকে নিয়ে তাই সমকালীন সাংস্কৃতিক, নান্দনিক, রাজনৈতিক পরিমণ্ডল হয়েছিল বিষম বিব্রত। প্রকৃতার্থে যুগের চাইতে আধুনিক ছিলেন তিনি।

ফারসি সাহিত্যের আরেক দিকপাল জালাল উদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩)। তাঁর কবিতারও অনুবাদ পাওয়া যায় নজরুলের নির্ঝর কাব্যগ্রন্থের 'বাঁশির ব্যথা' নামক কবিতায়। রুমির বাঁশির মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতার সুর রয়েছে, তা এ কবিতায় নজরুল গ্রহণ করেছেন, দেহকে তিনি বাঁশির সঙ্গে তুলনা করে তাতে সুরের উদ্বোধন কামনা করেছেন– 'এই যে আমার দেহ-বাঁশি, কান্না সুরের গুমরে তায়' ('বাঁশির ব্যথা')।

ফারসি সাহিত্যের আরেক দিকপাল জালাল উদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩)। তাঁর কবিতারও অনুবাদ পাওয়া যায় নজরুলের নির্ঝর কাব্যগ্রন্থের 'বাঁশির ব্যথা' নামক কবিতায়। রুমির বাঁশির মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতার সুর রয়েছে, তা এ কবিতায় নজরুল গ্রহণ করেছেন, দেহকে তিনি বাঁশির সঙ্গে তুলনা করে তাতে সুরের উদ্বোধন কামনা করেছেন– 'এই যে আমার দেহ-বাঁশি, কান্না সুরের গুমরে তায়' ('বাঁশির ব্যথা')। আবার বৈষ্ণব দর্শনের বা শ্যামের হাতের বাঁশিকেও তিনি প্রেম ও বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন– মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর হাতে রণতূর্য ('বিদ্রোহী')। এখানেও তিনি প্রাচ্য দেশীয় দুই দর্শনকে একাকার করে নিজ কাব্যে সম্মিলিত সুরের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

নজরুল-সাহিত্যের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে নজরুলের গান। এই গানে ফারসি সাহিত্যের প্রভাবকে স্বীকার করে নজরুল তাঁর নজরুল-গীতিকা (১৩৩৭, ভাদ্র) গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন ফারসি কবিদের –

আমার গানের বুলবুলিরা,
আমার বনের কুহু-কেকা!
পাঠাই সবুজ পাতায় ভ'রে
মোর কাননের কুসুম-লেখা।
তোমাদেরি সুর-সোহাগে
তোমাদেরি অনুরাগে
আমার কাঁটা-কুঞ্জে আজো
সন্ধ্যামণি গোলাব জাগে।
তোমাদেরে নজরানা দিই
সেই কুসুমের গন্ধ-গীতি,
শিশির সম জড়িয়ে থাকুক
আমার গানে সবার স্মৃতি। (রচনাবলী ২, ১৯৯৬; ৮০)

ভাব তো বটেই, ভাষার ক্ষেত্রেও নজরুল ফারসি ভাষার শব্দ গ্রহণ করেছেন অকৃপণভাবে। বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার মধ্যযুগ থেকেই কমবেশি ছিল। পুঁথিসাহিত্য এবং ভারতচন্দ্রের সাহিত্যে ফারসি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সচেতনভাবে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন; কিন্তু এ ধরনের শব্দ ব্যবহারে নজরুলের কৃতিত্ব সর্বাধিক। অনায়াস দক্ষতায় বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তিনি প্রচলিত ও অপ্রচলিত ফারসি শব্দ আত্মীকরণ ও সৃষ্টিশীলভাবে ব্যবহার করে বাংলা ভাষাকে ঋদ্ধ করেছেন। গবেষকের মতে, সমগ্র নজরুল সাহিত্যে আরবি-ফারসি-উর্দু বা অন্যান্য শব্দের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এই তিন হাজার শব্দের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ আরবি, শতকরা ৩০ ভাগ ফারসি শব্দ এবং শতকরা ১০ ভাগ উর্দু বা অন্যান্য শব্দ (আবদুস্ সাত্তার, ২০১৯; ২৭)। বাংলায় বহু ফারসি শব্দ প্রচলিত এবং পরিচিত; নজরুল পরিচিত ও অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত এবং প্রায় অপরিচিত সব ধরনের ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন অবলীলায়। যেমন – অগ্নি-বীণা কাব্যগ্রন্থের 'মোহর্‌রম' কবিতা থেকে উদ্ধৃত –

তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা
শমশের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা। (রচনাবলী ১, ১৯৯৬; ৪০)

এখানে 'শির' প্রচলিত ফারসি, 'শমশের' ও 'দামামা' অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত এবং 'আমামা' প্রায় অপরিচিত ফারসি শব্দ। এখানে দুই চরণে চারটি ফারসি শব্দের চমৎকার ব্যবহার দেখা যায়। এমন বহু উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র নজরুল-সাহিত্যে।

আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে নজরুলের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে সৈয়দ

আলী আশরাফ বলেছেন –

পুঁথি-সাহিত্যিকদের আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহারের সঙ্গে নজরুলের আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহারের পার্থক্য এই যে, পুঁথিকাররা যেখানে আরবী-ফারসী শব্দের বাংলা রূপ ব্যবহার করেছেন, সেখানে নজরুল ব্যবহার করেছেন মূল আরবী-ফারসী শব্দ।

প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে নজরুল এসব শব্দ ব্যবহার করেননি। তাঁর প্রবল শক্তিমত্তা প্রকাশের জন্য এ ধরনের অতিরিক্ত শব্দরাজির প্রয়োজন ছিল। তিনি সাফল্যের সঙ্গে আরো যে-সব অবদান সংযোজিত করেছিলেন তা হচ্ছে তাঁর আবেগ প্রকাশের রূপকল্প – এইসব রূপকল্প তিনি মুসলিম সমাজ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। (Muslim Tradition in Bengali Literature গ্রন্থ থেকে অনূদিত।)

নজরুল কাব্যে ব্যবহৃত একটি রূপকল্পের উদাহরণ দেয়া যায় জিঞ্জীর কাব্যের 'খালেদ' কবিতা থেকে–

বালু ফেড়ে ওঠে রক্ত-সূর্য ফজরের শেষে দেখি,

দুশমন-খুনে লাল হ'য়ে ওঠে খালেদী আমামা একি! (রচনাবলী ১, ১৯৯৬; ৪৩৬)

এ রূপকল্পেও ফারসি শব্দের অনুপম ব্যবহার লক্ষণীয়।

কেবল সাহিত্যে বৈচিত্র্য-সৃষ্টি অথবা আরবি-ফারসি শব্দে মুন্সিয়ানা দাখিলের জন্য নয়, নজরুল এসব শব্দ ব্যবহার করেছেন সচেতনভাবে বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনে। ইংরেজদের 'ভাগ কর এবং শাসন কর' নীতির বিপরীতে নজরুল সমগ্র-জীবন হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা করেছেন। সাহিত্যের বিষয়ে তো বটেই, শব্দ ব্যবহারেও তাঁর এ সচেতন প্রয়াস প্রযুক্ত ছিল সর্বদা। তাঁর ভাষায় –

আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্য হানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা করেছি। (রচনাবলী ৪, ১৯৯৬; ৪০০)

অর্থাৎ ফারসি শব্দ ব্যবহারেও নজরুলের ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী মনোভাবই কার্যকর ছিল।

নজরুল তাঁর ভাব-ভাষা এবং সাহিত্যিক জীবনের উন্মেষে ফারসি প্রভাবকে অঙ্গীভূত ও আত্মীকৃত করে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রাচ্যকে সমুন্নত করার সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতাও এ ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ছিল।

টীকা

১. কাজী নজরুল ইসলাম অনূদিত 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম'-এর ভূমিকায় সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন– 'গুণীরা বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই দুটি করে মাতৃভূমি– একটি তাঁর আপন জন্মভূমি ও দ্বিতীয়টি ফ্রান্স। কাজীর বেলা বাঙলা ও ইরান।'

২.সহায়ক গ্রন্থ

প্রাথমিক উৎস : কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৯৬ নজরুল রচনাবলী-১, ২, ৩, ৪, আবদুল কাদির (সম্পাদিত) বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

দ্বৈতীয়িক উৎস

১. অরুণকুমার বসু ২০১৯ নজরুল জীবনী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

২. আবদুস্ সাত্তার ২০১৯ নজরুল কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

৩. আহমদ শরীফ ১৯৬৯ বাঙলার সূফী সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৪. মলয় রায়চৌধুরী ২০১৬ রচনাসংগ্রহ-১, গাঙচিল, কলকাতা।

৫. মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৯১ মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, মনসুর মুসা (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী , ঢাকা।

৬. মো. কামাল উদ্দিন ২০২৩ নজরুল ও হাফিজের কবিতা শিল্প ও বৈশিষ্ট্য, ঝিঙেফুল, ঢাকা।

৭. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ১৯৯৪ পারস্যপ্রতিভা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

৮. শামসুল আলম সাঈদ ২০০৯ বাংলায় খৈয়াম ও নজরুল অনুবাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৯. সালাউদ্দীন আইয়ুব ১৯৯৭ নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জ্ঞানসাধক কবি ও সাংবাদিক
অধ্যাপক সিরাজুল হক

সুজন পারভেজ

[ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাবেক কর্মকর্তা ও 'নিউজলেটার' ম্যাগাজিনের সাবেক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল হক গত ২৬ জুন ২০২৫ নিউইয়র্ক সময় সকাল ১১:১৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় রাত ৯:১৫) নিউইয়র্কের কুইন্স সিটির কুইন্স হাসপাতালে কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর স্মরণে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনীর কিছু দিক পাঠকবৃন্দের সামনে তুলে ধরা হলো।]

বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক, লেখক, গবেষক ও অনুবাদক অধ্যাপক সিরাজুল হক ১৯৪৭ সালে বরিশাল জেলার 'আবদা বিশর' গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে ভোলা জেলার রাসুলপুর গ্রামে তাঁর পৈত্রিক নিবাস। ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সিরাজুল হক মাত্র দুই বছর বয়সে মাতৃহারা হন এবং অষ্টম শ্রেণিতে থাকাকালীন তাঁর বাবাকে হারান। তাঁর বাবা নূর বক্স হাওলাদার ছিলেন সমাজসেবক এবং দাদা ব্রিটিশ আমলের পোস্ট মাস্টার। অল্প বয়সেই পিতামাতাহীন হয়ে বেড়ে ওঠেন নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে, কিন্তু শিক্ষাজীবনে বরাবরই ছিলেন মেধার শীর্ষে। তিনি স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে বিএ অনার্স ও ১৯৭০ সালে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং এস এম হলের (স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম) ছাত্র ছিলেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে অবস্থানকালেই লেখালেখি, সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতা শুরু করেন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরী, ড. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ড. আবদুল হাই, ড. নীলিমা ইব্রাহিমসহ অনেকে। তিনি বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এছাড়া ছাত্র থাকাকালীন তুর্কি ভাষাও শিখেছিলেন।

সাংবাদিক সিরাজুল হকের কর্মজীবন শুরু হয় শিক্ষকতা পেশা দিয়ে। বরিশালের কামারখালি কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনীর হাতে আটক হয়ে নির্যাতিত হন। তাঁর ডায়েরিতে বঙ্গবন্ধুসহ রাজনৈতিক নেতাদের নাম ও নম্বর পাওয়ায় সন্দেহের তীর তাঁর দিকে ছোড়া হয়, তবে অলৌকিকভাবে তিনি প্রাণে বেঁচে যান।

শিক্ষকতার জীবনের এক পর্যায়ে তিনি গভীরভাবে সাংবাদিকতা, গবেষণা ও লেখালেখির জীবনে প্রবেশ করেন।

১৯৬৫ সালে সাপ্তাহিক 'Young Pakistan' পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর বর্ণাঢ্য সাংবাদিকতা জীবনের সূচনা হয়। কর্মজীবনে তিনি দৈনিক আজাদ ও দৈনিক জনপদসহ বিভিন্ন স্বনামধন্য পত্রিকায় গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। জনপদ-এ বিভিন্ন দায়িত্বে বহাল ছিলেন। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে দৈনিক জনপদের বার্তা ও নির্বাহী সম্পাদকের পদ অলংকৃত করে পরবর্তীকালে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন। এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে কিছুদিন ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন।

এছাড়াও জনাব সিরাজুল হক দ্য ডন, অধুনালুপ্ত মাসিক তাহজীব ও সাপ্তাহিক ইংরেজি "Walfajar" -এর সম্পাদক ছিলেন।

১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামি বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর ১৯৮৭ সালের ১৬ জানুয়ারি তেহরানে 'Islamic Propagation Organization' এ বাংলা বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। এছাড়া তিনি কিছুদিনের জন্য তেহরান টাইমস ও ইরান রেডিও তেহরানের সাথে (খণ্ডকালীন হিসেবে) জড়িত ছিলেন।

১৯৯০ সালের ৩০ জুলাই চাকুরি ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে আসেন। ১৯৯০ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বছর তিনি ঢাকাস্থ ইরানি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মুখপত্র নিউজলেটার-এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আনজুমানে ফারসি বাংলাদেশের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন। এছাড়াও তিনি ১৯৬৭ সালে গঠিত অনন্য সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ ও ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত আল্লামা ইকবাল রিসার্চ একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন দেশ সফর করেন। এছাড়া তিনি দেশে বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করে

গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ইরানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে ফারসি ভাষা প্রচারে বিশেষ অবদানের জন্য তাকে স্বর্ণমুদ্রা ও সনদ প্রদান করা হয়।

অধ্যাপক হক সাংবাদিকতা ও শিক্ষাক্ষেত্রে অসংখ্য তরুণকে উৎসাহিত করেছেন। কর্মজীবনে সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, আরব আমিরাত, ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, গ্রিস, লিবিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, রোমসহ বিশ্বের বহু দেশে ভ্রমণ করেন এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সফরসঙ্গীও ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন দেশ সফর করেন।

সিরাজুল হক ছিলেন জাতীয় প্রেসক্লাবের আজীবন সদস্য, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সক্রিয় সদস্য এবং বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চাও করেন।

কবিতা, শিশু-সাহিত্য, উপন্যাস, গবেষণা, প্রবন্ধ ও অনুবাদ গ্রন্থ সব মিলিয়ে তাঁর বইয়ের সংখ্যা ৩০ এর অধিক। তাঁর মৌলিক রচনা 'মুক্তির পথ' প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। 'বহতা নদীর মতো' তাঁর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

মৌলিক রচনাবলি

মুক্তির পথ (১৯৭২), হরেক রকম মজা, হাজার কাঠি (দুটি ছড়াগ্রন্থ), রাত পোহালো, ছুটির দিনে, ময়নার চিড়িয়াখানা (শিশুতোষ), বেদনার তিমিরে (গল্প গ্রন্থ), আন্ডিল গাঁওয়ের ইতিকথা (শিশুতোষ), ডেফোডিলের মতো, এসো বৃষ্টি ঝড়ের বেগে, হেজাযের পথে প্রান্তরে, মহানবীর মহাজীবন (প্রকাশের পথে)।

অনূদিত গ্রন্থাবলি

নিজের ঘরে অপরিচিত (১৯৬৬), সমাজতন্ত্র ও ইসলাম (১৯৬৬), তামাদ্দুনে আরব (১৯৭০), শহীদ হাসানুল বান্নার রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) (১৯৭৭), খতমে নবুয়্যত (১৯৮৫), যুদ্ধ ও সন্ধি (১৯৮৭), হিজরত ও জিহাদ (১৯৮৮), মহানবীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত (১৯৯১), ইসলামী আদর্শ : একটি বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা (১৯৯১), আজকের মানুষ ও সামাজিক সংকট (১৯৯৩), সত্যের আহ্বান (১৯৯৩), ঝর্ণার প্রহরী (১৯৯৩), তাহেরার নামে পত্র (অনুবাদ গ্রন্থ)।

তিনি কয়েকটি আরবি পুস্তকেরও বঙ্গানুবাদ করেন। ফারসি-বাংলা অভিধান যৌথ সম্পাদনা করেন।

তাঁর প্রবন্ধ সংকলন দিন যায় কথা থাকে (যন্ত্রস্থ), সফরনামা (যন্ত্রস্থ), প্রবন্ধসংগ্রহ (যন্ত্রস্থ)।

এছাড়া বাংলায় অনূদিত সহীহ আল-বুখারি, পারলৌকিক জীবন এবং ইসলামের দৃষ্টিতে কাদিয়ানী ও বাহাই মতবাদসহ কতিপয় গ্রন্থের সম্পাদনা করেন।

তাঁর বড় ছেলে অধ্যাপক ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিনিয়র শিক্ষক। অধ্যাপক সিরাজুল হক স্মরণে আমার রচিত একটি কবিতা :

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী
অধ্যাপক সিরাজুল হক জ্ঞানপূজারী।
লেখা পড়াই যার নেশা
যাকে দেখলে দূর হয় নিরাশা।

নির্যাতিত আর নিপীড়িত মানুষের ব্যথা
যার কবিতার মূল কথা
ন্যায় নীতি ও অন্যায়ের প্রতিবাদে
শক্তিশালী বজ্রকণ্ঠ হয়ে বাজে।
ইসলামের সৌন্দর্য ও শান্তির বাণী
যার কথা ও কবিতার কাহিনী
বহুভাষাবিদ ও জ্ঞান সাধক হয়ে
কাজ করেছেন নিভৃত অন্তরালে
তাঁর বহতা নদী, ডেফোডিল ও বৃষ্টি ঝড়ের আকাশে
সাতটি ছড়ার সিতারা জ্বলছে আলো হয়ে।।

মানবিক চেতনাসম্পন্ন এক সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব ২৯ জুন রবিবার সকালে আমেরিকা থেকে মরহুমের মরদেহ ঢাকায় আনা হয়। পরে ঐ দিনই বাদ আছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আজিমপুর কবরস্থানে তাঁর সহধর্মিণীর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

লেখক : শিক্ষার্থী, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরানি নারীদের সাফল্য

সাইদুল ইসলাম

নারী সমাজ আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আজ যে পৃথিবী সভ্যতার পথে এগিয়ে চলছে তার অগ্রযাত্রায় রয়েছে নারীর বিশেষ ভূমিকা। তাইতো নেপোলিয়ন বলেছিলেন, 'আমাকে একজন ভালো মা দাও, আমি তোমাকে একটি ভালো জাতি দেব।' নারী হলেন মানুষের প্রথম শিক্ষক। মানুষ গড়ার অন্যতম প্রধান কারিগর। শুধু তাই নয় সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ইতিবাচক রূপান্তরে নারীরা জড়িয়ে আছেন আবহমানকাল থেকেই। নারী সমাজের উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। নারীরা তাঁদের বহুমুখী দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিশ্বের দেশগুলোর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় যেমনটি বলেছেন,

তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ ১৮ নারী গবেষক

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বারবারই দেখা গেছে, সেই সমাজ উন্নত হয়, যেখানে নারীরা এগিয়ে আসেন বিভিন্ন পেশায়, তৎপর হন সর্বক্ষেত্রে। নারীর উন্নয়নে বিশ্বের যে দেশগুলো এগিয়ে রয়েছে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান তাদের অন্যতম। জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, খেলাধুলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরানের নারীদের সাফল্য চোখে পড়ার মতো।

সম্প্রতি তেহরানের ইরান হাউস অব ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজিতে (আইএইচআইটি) 'ইরানি নারী, অলিখিত গল্প' শিরোনামে ইরানি নারীদের অর্জনের উপর একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইরানের নারী ও পরিবার বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট জাহরা বেহরুজ-আজার নারীর ক্ষমতায়নে বর্তমান প্রশাসনের দৃঢ় সংকল্প তুলে ধরেন। পাশাপাশি নারীদের অর্জিত সাফল্যের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। নারীদের সহায়তার উপর আলোকপাত করে এমন জাতীয় নীতিগত নথির উল্লেখ করে এই কর্মকর্তা বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশটি নারীদের অবস্থা উন্নত করতে পদক্ষেপ নিয়েছে। ইরানি নারীদের আয়ু ৭৮ বছরে পৌঁছেছে। প্রায় ৯৫ শতাংশ সন্তান প্রসব বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে হয়। ফলে মাতৃমৃত্যু হ্রাস পেয়েছে। দেশের বিশেষজ্ঞদের ৪০ শতাংশ এবং উপ-বিশেষজ্ঞদের ৩০ শতাংশ নারী চিকিৎসক বলে জানান বেহরুজ-আজার।

শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য তিন শতাংশে নেমে আসার সাথে সাথে ইরান শিক্ষাগত সমতা বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সফল দেশগুলোর মধ্যে একটি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে নারীদের ৫৬ শতাংশ অংশগ্রহণ রয়েছে। তাঁরা ৭৮৪টি কারিগরি ও প্রকৌশল বিভাগে অধ্যয়নরত। চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষদ সদস্যদের মধ্যে নারী যথাক্রমে ৪০ এবং ৩০ শতাংশ।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে সারা দেশে ২৩ হাজার ৫৪৩ জন নারী লেখক, ১ হাজার ৫১ জন প্রকাশক, ৪৩৫ জন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক এবং ১ লাখ ৮১ হাজারের বেশি নারী বই প্রকাশনার লাইসেন্সধারী রয়েছেন।

এছাড়াও, ২ হাজার ৩৩৬ জন নারী মিডিয়া ম্যানেজার এবং ২০ হাজার ৭৬২ জন নারী প্রকাশক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বলে তিনি জানান।

গত বছরের ডিসেম্বরে তেহরান টাইমস-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উচ্চ প্রযুক্তির পণ্য তৈরিতে এবং জ্ঞান-ভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশে দুর্দান্ত অগ্রগতি অর্জন করে চলেছেন ইরানি নারীরা। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বকে তাঁরা এই বার্তা দিচ্ছেন, অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই 'প্রযুক্তি' ক্ষেত্রেও তাঁদের উজ্জ্বল

সম্ভাবনা রয়েছে।

ইরানি নারীরা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ইভেন্টে দারুণ সাফল্য দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের দক্ষতা পুরো বিশ্বই প্রত্যক্ষ করেছে। ইরানে জ্ঞান-ভিত্তিক কোম্পানিগুলোর পরিচালনা পর্ষদে মহিলা সিইও এবং চেয়ারপারসনের সংখ্যা গত তিন বছরে লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে।

ইরানে নারী ব্যবস্থাপকের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০ মার্চ থেকে শুরু হওয়া গত ইরানি বছরের প্রথম নয় মাসের শেষে এই সংখ্যা ১ হাজার ৯২ জন থেকে বেড়ে ২ হাজার ২৫০ জনে দাঁড়িয়েছে।

আধুনিক, প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলির ১২ শতাংশ ইরানি নারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানভিত্তিক কোম্পানিগুলির পরিচালনা পর্ষদের ২৭ হাজার ২৩৭ জন সদস্যের মধ্যে রয়েছেন ৫ হাজার ১৫৪ জন নারী, যা মোট সদস্যের ১৯ শতাংশ।

সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ইভেন্টে, আজম কারামি, মাহভাশ আবিয়ারি,

উচ্চ প্রযুক্তির পণ্য তৈরীতে দুর্দান্ত অগ্রগতি অর্জন করে চলছে ইরানী নারীরা

মারজি ইব্রাহিমি এবং ফাতেমে হোসেইনি নামে চারজন ইরানি নারী ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁরা ব্রিকস উদ্যোক্তা ফোরামের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি 'ব্রিকস নারী স্টার্টআপ প্রতিযোগিতা ২০২৪'-এর বিজয়ীদের মধ্যে ছিলেন। প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক বিচারক প্যানেল ৩০টি দেশের হাজারের অধিক আবেদন বিবেচনা করেছেন।

প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে ২৬টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন : জ্বালানি ও অবকাঠামোগত সুবিধায় উদ্ভাবন; চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি এবং বিমান শিল্পে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি; ক্যান্সার এবং বন্ধ্যাত্বের বিরুদ্ধে লড়াই; এবং রোবোটিক্স। স্টার্টআপ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সংখ্যার দিক থেকে ইরানি নারীরা রাশিয়ার পরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন।

আজম কারামি বৈদ্যুতিক প্রকৌশল (টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম) বিষয়ে পিএইচডি করেছেন। তিনি একটি জ্ঞানভিত্তিক কোম্পানি পরিচালনা করছেন যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, ড্রোন এবং রিমোট সেন্সিং, বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষণ, ডেটা মাইনিং এবং ইন্টারনেট অফ থিংসের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত পরিষেবা প্রদান করে এবং পণ্য বিকাশ করে।

ফাতেমে হোসেইনি একটি জ্ঞানভিত্তিক কোম্পানির ব্যবস্থাপক। তাঁর কোম্পানি মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের জীবন উন্নত করার জন্য নতুন পণ্য তৈরি করে।

জ্ঞানভিত্তিক এই কোম্পানিটির পণ্য ইন্টেলিজেন্ট স্পুন ফর ট্রেমার অ্যালিভেশন (আইএসটিএ) মোশন সেন্সর এবং একটি বুদ্ধিমান উচ্চ-গতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যবহার করে কম্পন কমিয়ে কম্পন আক্রান্ত রোগীদের স্বাধীনভাবে এবং চাপ ছাড়াই খেতে সাহায্য করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের পরে ইরান তৃতীয় দেশ যেখানে এই প্রযুক্তি রয়েছে।

মারজিহ ইব্রাহিমি একটি কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও। তাঁর বিজয়ী প্রকল্পের শিরোনাম ছিল 'ক্যান্সার এবং অটোইমিউন রোগের চিকিৎসার জন্য ইমিউন সেল ব্যাংক'। প্রাকৃতিক ঘাতক (এনকে) কোষ রূপান্তরিত বা অকার্যকর কোষ নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যার ফলে সামগ্রিক স্বাস্থ্য বজায় থাকে।

মাহভাশ আবিয়ারির স্টার্টআপ প্রকল্পটি ছিল 'ইনসাইটফুলি স্ক্যানড গ্লুকোজ মনিটরিং'। প্ল্যাটফর্মটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে রোগীর আচরণ বিশ্লেষণ করে, রোগীদের জন্য আরও সঠিক প্রেসক্রিপশন তৈরিতে ডাক্তারদের প্রতিবেদন সরবরাহ করে।

একটি জ্ঞানভিত্তিক কোম্পানির ব্যবস্থাপক নাফিসে হাতামি একটি 'ব্যাপক ডিজিটাল প্রমাণীকরণ প্ল্যাটফর্ম' তৈরি করেছেন। সর্বাধিক যুগোপযোগী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অ্যালগরিদম ব্যবহার করে এই জ্ঞানভিত্তিক কোম্পানিটি খুব দ্রুত ব্যবসার জন্য ডিজিটাল প্রমাণীকরণ এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়নে সফল হয়েছে এবং ইরানে ডিজিটাল অর্থনীতি এবং ডিজিটাল রূপান্তর গড়ে তুলেছে।

চলতি বছরের মার্চ মাসে জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের উপ-প্রতিনিধি জাহরা এরশাদি নারীর অবস্থা সম্পর্কিত কমিশনের এক সভায় বলেছেন, 'যদিও বাইরের কিছু দেশ চাপের মাধ্যমে ইরানি নারীদের অধিকার ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারপরও তাঁরা

নিজেদের এবং তাঁদের সমাজের জন্য আরও ন্যায়সঙ্গত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

জাতিসংঘের নারীর অবস্থা সম্পর্কিত কমিশনের ৬৯তম অধিবেশনে জাহরা এরশাদি বলেন, 'একতরফা নিষেধাজ্ঞার নেতিবাচক প্রভাব এবং সর্বোচ্চ চাপ সত্ত্বেও ইরানি নারীরা অগ্রগতির পথে হাঁটতে এবং তাঁদের সমাজ ও পরিবারকে আরো শক্তিশালী করতে বদ্ধ পরিকর।'

তিনি বলেন, প্রতি বছর ইরানে ৩০০০০০ গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, যা নারী-নেতৃত্বাধীন ব্যবসা এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। বর্তমানে ইরানে ৩২,০০০ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান নারীদের মালিকানাধীন। দেশটিতে নতুন চাকরির ৪১ শতাংশের জন্য ইরানি নারীদের অবদান রয়েছে। বর্তমান সরকারে, ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ব্যবস্থাপনা পদে ১৯০ জনেরও বেশি নারীকে নিয়োগ করা হয়েছে, যার মধ্যে মন্ত্রিসভায় রয়েছেন চারজন (সরকারি মুখপাত্র এবং সড়ক ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রীসহ), ১৪ জন নারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান, ১৩ জন উপমন্ত্রী, ১৭ জন উপদেষ্টা এবং সহকারী মন্ত্রী, ১১০ জন মহাপরিচালক, ১৭ জন গভর্নর এবং ১৬ জন মহিলা গভর্নর।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ইরানের তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের দরবারে তাদের শীর্ষ ১৮ জন নারী গবেষকের পরিচয় তুলে ধরেছে। এসব নারী গবেষক জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সর্বাধিক আলোচিত গবেষকের তালিকায় স্থান পেয়েছেন। ইসলামিক ওয়ার্ল্ড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি মনিটরিং অ্যান্ড সাইটেশন ইনস্টিটিউট এই ঘোষণা দিয়েছে।

প্রতিবেদন মতে, বিজ্ঞান অনুষদের অনুষদ সদস্য ড. ফারনুশ ফরিদবোদ এবং ড. ফারজানে শেমিরানি এবং তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি অনুষদের অনুষদ সদস্য ড. ফেরেশতে রাশচি ২৭ বছর ধরে (১৯৯৬-২০২৩) বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত গবেষকদের মধ্যে শীর্ষ ২ শতাংশের মধ্যে রয়েছেন।

ওয়েব অব সায়েন্স (ডব্লিউওএস) ডাটাবেজের তথ্যমতে, কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ অনুষদের অনুষদ সদস্য ড. জাহরা ইমামজোমে এবং ড. মারইয়াম সালামি, প্রযুক্তি অনুষদের অনুষদ সদস্য ড. আকরাম হোসেনিয়ান সারাজেলু, আন্তঃবিষয়ক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের অনুষদ সদস্য ড. ফাতেমে ইয়াজদিয়ান এবং ড. রোকায়ে ঘাসেমপুর এবং প্রশাসন অনুষদের অনুষদ সদস্য ড. রেহানেহ লোনি ১০ বছরের (২০১৪-২০২৪) সময়কালে বিশ্বের শীর্ষ এক শতাংশ উচ্চ-উল্লেখিত গবেষকের মধ্যে রয়েছেন।

এছাড়াও, বিজ্ঞান অনুষদের অনুষদ সদস্য ড. সেপিদে খোয়েই এবং ড. হেদি সাজেদি এবং তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের গবেষক ড. মিত্রা মুসাভিও ২০২৩ সালে এলসেভিয়ার-স্ট্যানফোর্ডের উচ্চ-উল্লেখিত আন্তর্জাতিক গবেষকদের তালিকায় শীর্ষ দুই শতাংশের মধ্যে স্থান পান। আরো যেসব ক্ষেত্রে ইরানি নারীরা সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন তার কিছু বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

বিশ্বের শীর্ষ ১ ভাগ আলোচিত গবেষকের মধ্যে ১৩০ ইরানি নারী

২০২৩ সালে বিশ্বের শীর্ষ এক শতাংশ সর্বাধিক উদ্ধৃত গবেষকদের মধ্যে স্বীকৃত ৯৩৮ ইরানি গবেষকদের মধ্যে রয়েছেন প্রায় ১৩৫ জন নারী স্কলার। ২০২৩ সালে ইরানি সংস্থাগুলির সাথে যুক্ত ৯৩৮ জন শীর্ষ গবেষককে চিহ্নিত করা হয়। আগের বছরের তুলনায় ইরানের শীর্ষ গবেষকের সংখ্যা ১২ শতাংশ বেড়েছে। গত এক দশক ধরেই দেশটিতে উচ্চ-উদ্ধৃত গবেষকের সংখ্যা বাড়ছে। ইসলামিক ওয়ার্ল্ড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি মনিটরিং অ্যান্ড সাইটেশন (আইএসসি) ইনস্টিটিউটের প্রধান আহমেদ ফাজেলজাদে বলেছেন, নারীরা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, মানব সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

ইরানের নাজাফিজাদের ওমেন ইন ট্রান্সপ্লান্টেশন অ্যাওয়ার্ড লাভ

ইরানি অঙ্গ দান সমিতির পরিচালক কাতায়াউন নাজাফিজাদে ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন সোসাইটির ৩০তম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে (টিটিএস ২০২৪) ওমেন ইন ট্রান্সপ্লান্টেশন অ্যাওয়ার্ড এর আনসাং হিরো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর ইস্তাম্বুলে টিটিএস ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটি পরিষেবা স্বেচ্ছাসেবী, পরামর্শদান বা অন্যান্য সম্প্রদায়ভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিস্থাপনের উপর অসাধারণ প্রভাব ফেলেন, এমন একজন নারীকে প্রতিবছর পুরস্কারটি দেওয়া হয়।

বার্তা সংস্থা ইরনার প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্লিনিকাল নির্দেশিকা ও

অনুশীলন, শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম প্রচার ও ক্লিনিক্যাল যত্ন এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর অর্গান ডোনেশান অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট (আইএসওডিপি)। উল্লেখ্য, ইরানে প্রায় ২৫ হাজার লোক প্রতিস্থাপনের জন্য অপেক্ষার তালিকায় রয়েছে এবং প্রতি দশ মিনিটে একজন নতুন ব্যক্তি তালিকায় যুক্ত হয়।

ইরানি নারী উদ্ভাবকের ডব্লিউআইপিও পুরস্কার জয়

ইরানের নারী উদ্ভাবক হাসতি-সাদাত হোসেইনি বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার (ডব্লিউআইপিও) পুরস্কার জিতেছেন। একইসাথে তিনি ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইনভেন্টরস অ্যাসোসিয়েশনের

(আইএফআইএ) উদ্ভাবন মান (আইআইএস) সার্টিফিকেট পেয়েছেন। জেনেভায় আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন প্রদর্শনীর ৫০তম আসরে তাঁর আবিষ্কার 'হ্যাস্টিসেল' এর জন্য তিনি এই পুরস্কার জিতেছেন।

চলতি বছরের ৯ থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত ৪২টি দেশ ও অঞ্চল থেকে ১ হাজার ৪৩টি উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। এবারের সংস্করণে ২৮ হাজারের বেশি দর্শনার্থী অংশ নেন। হোসেইনির উদ্ভাবিত 'হ্যাস্টিকেল' আইএফআইএ ইনোভেশন স্ট্যান্ডার্ড গ্রেড 'এ' পেয়েছে।

২০২৪ সিএএফএ অনূর্ধ্ব-১৫ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে ইরানের শিরোপা জয়

স্বাগতিক তাজিকিস্তানকে ৪-০ গোলে পরাজিত করে ইরান ২০২৪ সিএএফএ অনূর্ধ্ব-১৫ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে। ২০১৯ সালের চ্যাম্পিয়ন ইরান এর আগে তাজিকিস্তানের দুশানবেতে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে কিরগিজস্তানকে ৫-১ এবং ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন উজবেকিস্তানকে ১-০ গোলে হারায়।

উজবেকিস্তান ছয় পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় এবং কিরগিজস্তান তিন পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় অবস্থান দখল করে। শেষ পর্যন্ত, ইরানের মারইয়াম খলিলিফার পাঁচ গোল নিয়ে প্রতিযোগিতার শীর্ষ স্কোরার হিসাবে নির্বাচিত হন এবং ইয়াসনা সৌমেহসারাইকে এমভিপি হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।

সৌদি আরবে ইরানি নারীর ইসলামি বিশ্বের পরিবেশ পুরস্কার জয়

ইসলামি বিশ্বের পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় অবদানের জন্য সৌদি আরবে কিংডম পুরস্কার (কেএসএএইএম) জিতেছেন ইরানি নারী বিজ্ঞানী লোবাত তাগাভি। তিনি কেএসএএইএম এর গবেষণা, অর্জন এবং সফল অনুশীলন বিভাগে দ্বিতীয় পুরস্কার জিতেছেন।

'ওমেনস অ্যাওয়ার্ড ফর রিসার্চ, অ্যাচিভমেন্টস অ্যান্ড সাকসেসফুল প্র্যাকটিসিস' শীর্ষক এই বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন সৌদি আরবের ড. হানান আল-মাহাশির এবং দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন ইরানি ড. লোবাত তাগাভি।

ইসলামিক ওয়ার্ল্ড এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল

অর্গানাইজেশন (আইসিইএসসিও) এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সৌদি আরবের আয়োজনে ইসলামিক বিশ্বের পরিবেশ মন্ত্রীদের ৯ম সম্মেলনে মুসলিম বিশ্বে পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় অবদানের জন্য ১৮টি দেশের ২২ জন বিজয়ী কেএসএএইএম পুরস্কার পেয়েছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরানি নারীদের সাফল্যের এই তালিকা দিন দিনও দীর্ঘ হচ্ছে যা এই সীমিত পরিসরে তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব। তবে একথা বলা যায়, ইরানের নারীদের সফলতার এই ধারা অব্যাহত থাকলে দেশটি একদিন উন্নয়নের রোলমডেল হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তেহরানের খুঁটিনাটি

মোঃ কামাল হোসাইন

তেহরানের নামকরণ নিয়ে ইরানি ভাষাবিদ আহমদ কাসরাভি 'শেমিরান-তেহরান' নামক একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, তেহরান ও কেহরানের অর্থ 'উষ্ণ স্থান' এবং 'শেমিরান' অর্থ 'ঠাণ্ডা স্থান'। তেহরান ও কেহরান বিভিন্ন ইরানি ভাষা পরিবারে একই জিনিস বোঝায়, কারণ, 'ত' এবং 'ক' এই ধরনের ভাষায় একে অপরের কাছাকাছি। তিনি আরও প্রমাণ দিয়েছিলেন যে, 'শেমিরান' নামে পরিচিত শহরগুলো শীতল ছিল এবং 'তেহরান' বা 'কেহরান' নামে পরিচিত শহরগুলো খুব গরম ছিল। আরেকটি ধারণা হলো যে, 'তেহরান' এসেছে 'তিরান' বা 'তিরগান' থেকে ('তিরের আবাস', জরাথ্রুস্টবাদে হার্মিসের সমতুল্য)। প্রাচীন পার্থিয়ান শহর তিরানের একটি প্রতিবেশী ছিল 'মেহরান' ('মেহর' বা 'মিত্রার আবাস', যা জরাথ্রুস্টীয়দের সূর্যদেবতা)। এই দুটিই ছিল বৃহৎ শহর রেই বা রেজেসের শহরতলির নিছক গ্রাম। মেহরান এখনও বৃহত্তর তেহরানের একটি আবাসিক জেলা হিসেবে বিদ্যমান।

অব ও অতাশ পার্ক

তেহরান শহরের দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে যে, 'তেহরান' এসেছে ফারসি শব্দ 'তাহ' থেকে, যার অর্থ 'শেষ বা নিচে' এবং 'রান' অর্থ [পর্বতের] ঢাল। তাই 'তেহরান' এর আক্ষরিক অর্থ পাহাড়ের পাদদেশ। আলবোর্জ পর্বতমালার পাদদেশে তেহরানের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এটিই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য অভিমত।

তেহরান আলবোর্জ পর্বতের দক্ষিণে এবং দামাভান্দ পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত। দামাভান্দ ইরানের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। যার উচ্চতা ৫৬৭১ মিটার। তেহরান ২৩০ বছর পূর্বে ইরানের রাজধানী হিসেবে পরিগণিত হয়। এর আয়তন ৭৪০ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ১৪.৫ মিলিয়নের বেশি। গত ১০০ বছর ধরে ইরানের বিভিন্ন শহর থেকে লোকজন ধীরে ধীরে তেহরানে এসে বসতি স্থাপন করে তেহরানকে গড়ে তুলেছে। আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে তেহরান ইরানের অন্যতম বড় শহর। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব সমধিক।

ইরানের পাবলিক সেক্টরের কর্মীবাহিনীর প্রায় ৩০% তেহরানের এবং এর ৪৫% বড় শিল্প সংস্থা এই শহরে অবস্থিত এবং এই শ্রমিকদের প্রায় অর্ধেকই সরকার দ্বারা নিযুক্ত। বাকি শ্রমিকদের অধিকাংশই কারখানার শ্রমিক, দোকানদার, শ্রমিক এবং পরিবহন শ্রমিক। সরকারের জটিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কারণে তেহরানে অল্পকিছু বিদেশী কোম্পানি কাজ করে। কিন্তু ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের আগে ইরানে অনেক বিদেশী কোম্পানি সক্রিয় ছিল। তেহরানের বর্তমান আধুনিক শিল্পের মধ্যে রয়েছে অটোমোবাইল, ইলেক্ট্রনিক্স এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, অস্ত্র, টেক্সটাইল, চিনি, সিমেন্ট এবং রাসায়নিক পণ্য তৈরি। এটি কার্পেট এবং আসবাবপত্র বিক্রয়ের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। পার্স অঞ্চলে, স্পিডি এবং তেল পরিশোধনকারী কোম্পানিগুলো অধিকাংশ তেহরানে অবস্থিত।

তেহরান প্রাইভেট কার, বাস, মোটরসাইকেল এবং ট্যাক্সির উপর অনেক বেশি নির্ভর করে এবং এটি বিশ্বের অন্যতম গাড়িনির্ভর শহর। তেহরান স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ এক্সচেঞ্জের (WFE) পূর্ণ সদস্য এবং ফেডারেশন অফ ইউরো-এশিয়ান স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এটি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের সেরা পারফরম্যান্সকারী স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর মধ্যে একটি।

তেহরান শুরুর দিকে ছিল দক্ষিণ ইরানের ছোট একটি গ্রাম। সাফাভি বাদশাহগণ এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং এর ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করেন। শাহ তাহমাসাব তাঁর সময়কালে ঐ গ্রামে প্রচুর ঘরবাড়ি তৈরি করেন। কাচার শাসনামলে এই গ্রাম শহরে রূপান্তরিত হয়। এখানে অনেক নতুন নতুন স্থাপনা নির্মিত হয়। এখনো শহরের বিভিন্ন স্থানে তার নিদর্শন বিদ্যমান। পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত হওয়ায় তেহরানের আবহাওয়া ইরানের অন্য শহর থেকে বেশি উপভোগ্য।

তেহরানের ঠাণ্ডা আধা-শুষ্ক জলবায়ু মহাদেশীয় জলবায়ু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং একটি ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বৃষ্টিপাতের প্যাটার্ন রয়েছে। তেহরানের জলবায়ু মূলত এর ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়, এর উত্তরে বিশাল আলবোর্জ পর্বতমালা এবং দক্ষিণে

দেশটির কেন্দ্রীয় মরুভূমি। এটি সাধারণত বসন্ত ও শরৎকালে হালকা, গ্রীষ্মে গরম ও শুষ্ক এবং শীতকালে ঠাণ্ডা ও আর্দ্র হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

যেহেতু শহরের একটি বিশাল এলাকা রয়েছে, বিভিন্ন জেলার মধ্যে উচ্চতায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে, তাই তেহরানের সমতল

আমীর কবীর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

দক্ষিণ অংশের তুলনায় পাহাড়ি উত্তরে আবহাওয়া প্রায়ই শীতল হয়। গ্রীষ্মকাল দীর্ঘ, গরম এবং অল্প বৃষ্টির সাথে শুষ্ক, তবে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সাধারণত কম থাকে, যা তাপকে সহনীয় করে তোলে। গড় উচ্চ তাপমাত্রা ৩২ এবং ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৯০ এবং ৯৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট), এবং এটি মাঝে মাঝে রাতে শহরের উত্তরে পাহাড়ি এলাকায় ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৫৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট) হয়। বেশিরভাগ হালকা বার্ষিক বৃষ্টিপাত হয় শরতের শেষ থেকে বসন্তের মাঝামাঝি পর্যন্ত, তবে কোনো মাসই বিশেষভাবে বর্ষণমুখর থাকে না। উষ্ণতম মাস হলো জুলাই, যার গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৭৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট) এবং গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৯৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট), এবং সবচেয়ে ঠাণ্ডা জানুয়ারি, যার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১ ডিগ্রিসেলসিয়াস (৩৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট)। তেহরানের আবহাওয়া কখনও কখনও অপ্রত্যাশিতভাবে রুক্ষ হতে পারে। রেকর্ড সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস (১০৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট)।

এখানকার অধিকাংশ জনসংখ্যা মুসলমান এবং শিয়া মতাবলম্বী, কিছু সুন্নি মুসলিমও রয়েছেন। এছাড়া ইহুদি, খ্রিস্টান, অগ্নি উপাসক ও আরমানি জনগোষ্ঠী রয়েছে। অধিকাংশ লোকের ভাষা ফারসি। তাঁরা তেহরানি উচ্চারণে কথা বলেন, তবে মাযেন্দারানী, আরবি, লোর, আযারি প্রভৃতি ভাষাভাষী লোকও রয়েছে। জনসংখ্যার দিক থেকে এটি বিশ্বের ৩৪তম এবং মধ্যপ্রাচ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে এটি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম সেরা শহর। বায়ুদূষণ এবং ভূমিকম্পের কারণে ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে অন্য এলাকায় স্থানান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে, যদিও এখন পর্যন্ত অনুমোদন পায়নি। তেহরান দ্রুত বর্ধনশীল শহরের তালিকায় রয়েছে।

তেহরান মহানগরী ২২টি পৌর জেলায় বিভক্ত, যার প্রতিটির নিজস্ব প্রশাসনিক কেন্দ্র রয়েছে। ২২টি পৌর জেলার মধ্যে ২০টি তেহরান কাউন্টির কেন্দ্রীয় জেলায় অবস্থিত এবং ১ ও ২০ নং জেলা যথাক্রমে শেমিরানাত ও রেই কাউন্টিতে অবস্থিত। প্রশাসনিকভাবে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও রেই ও শেমিরান শহর দুটি প্রায়ই বৃহত্তর তেহরানের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। উত্তর তেহরান শহরটির সবচেয়ে অভিজাত অংশ যা জাফারানি, জর্ডান, এলাহি, পাসদারান, কামরানি, আজোদানি, ফারমানি, দারুস, কিয়েতারি ও কারব টাউনের মতো বিভিন্ন জেলা নিয়ে গঠিত। যদিও শহরের কেন্দ্রে সরকারি মন্ত্রণালয় ও সদর দপ্তর রয়েছে, বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলো আরও উত্তরে অবস্থিত।

তেহরান পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা : উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য তেহরান। প্রত্যেকটি অঞ্চলে প্রচুর দর্শনীয় স্থান রয়েছে। তেহরানের রয়েছে খাবারের সুখ্যাতি। নানা স্বাদের খাবারের ক্ষেত্রে তেহরানের জুড়ি মেলা ভার। তাছাড়া অলি গলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা প্রকার রুটি, রান্না করা খাবার, ফল-ফলাদির দোকান। অলি গলিতে ঘুরতে ঘুরতে অনেক দর্শনীয় স্থান, প্রাচীন পুরাকীর্তি চোখে পড়বে। এগুলো দেখামাত্রই তৎকালীন বাদশাহদের কথা মনে পড়বে। তাঁরা তাঁদের সময়কালে রাজত্ব করেছেন আর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তার নিদর্শন রেখেছেন। যেমন : কাখে মৌযে গোলেস্তান (গুলিস্তান প্রাসাদ জাদুঘর), কাখে মৌযে সাইদ আবাদ (সাইদ আবাদ প্রাসাদ জাদুঘর), কাখে মৌযে নিয়াভারান (নিয়াভারান প্রাসাদ), তেহরান বাজার, জাতীয় উদ্যান, বোর্জে আযাদি (স্বাধীনতা টাওয়ার) প্রভৃতি।

বিনোদনের জন্য রয়েছে পুলে তাবিয়াত, বোস্তানে মিনিয়াতুর, দারিয়াচে চিতগার, বোর্জে মিলাদ (মিলাদ টাওয়ার), বামে তেহরান, তেহরানের উঁচু স্থান, বাগে কেতাব, ইরান মল, পার্কে অবি প্রভৃতি। অন্যান্য পবিত্র ধর্মীয় দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে ইমাম যাদেহ সালেহ, শাহ আবদুল আজিম হোসাইনী, সারকিস গির্জা, কানিসে হাইম (ইহুদি গির্জা), অতাশকাদেহ আদরাবিয়ান প্রভৃতি।

আযাদি স্কয়ার

তেহরানে চলাচলের জন্য রাস্তার একটি নেটওয়ার্ক রয়েছে যা সমগ্র তেহরানে জালের মতো বিছানো। এসব রাস্তার কোনোটিতে খাবারের দোকান, কোনোটিতে শপিংমল, কোনোটি যানবাহন চলাচলের পাশাপাশি দিনরাত্রি পায়চারির কাজে ব্যবহৃত হয়। বিখ্যাত কয়েকটি রাস্তা হলো- খিয়াবানে আলি আসর, ময়দানে হোসাইন আবাদ, খিয়াবানে ফেরেশতে, খিয়াবানে সি তির,

ময়দানে ইমাম খোমেইনি প্রভৃতি। তেহরানের বেশ কয়েকটি রাস্তার নাম আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের নামে রাখা হয়েছে, যার মধ্যে

গোলেস্তান প্যালেস

রয়েছে : হেনরি করবিন স্ট্রিট (মধ্য তেহরান), সাইমন বলিভার বুলেভার্ড (উত্তর-পশ্চিম তেহরান), এডওয়ার্ড ব্রাউন স্ট্রিট (তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে), গান্ধী স্ট্রিট (উত্তর তেহরান), মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এক্সপ্রেসওয়ে (পশ্চিম তেহরান), ইকবাল লাহোরি স্ট্রিট (পূর্ব তেহরান), প্যাট্রিস লুমুম্বা স্ট্রিট (পশ্চিম তেহরান), নেলসন ম্যান্ডেলা বুলেভার্ড (উত্তর তেহরান), ববি স্যান্ডস স্ট্রিট (ব্রিটিশ দূতাবাসের পশ্চিম দিকে) প্রভৃতি।

শহরের অভ্যন্তরে চলাচলের জন্য বিভিন্ন প্রকার বাহন রয়েছে। তেহরান যেহেতু বেশ বিস্তৃত শহর তাই এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে বেশ কয়েক ঘণ্টা লেগে যায়। তাছাড়া কোনো কোনো রাস্তায় ট্রাফিক জ্যামও দেখা যায়। প্রসিদ্ধ যানবাহনের মধ্যে রয়েছে মেট্রো। মেট্রো বেশ জনপ্রিয়। সাতটি রুটে মেট্রো পরিচালিত হয়। প্রতিদিন সকাল ৫.৩০ থেকে রাত ১০.৩০ পর্যন্ত মেট্রো চলাচল করে। তেহরানে চলাচলের সবচেয়ে জনপ্রিয় যানবাহন এটি। এছাড়া শহরের সর্বত্র, এমনকি শহর থেকে বাইরে যেতে আছে বাস। বেশ কয়েকটি বড় বড় বাস টার্মিনাল রয়েছে তেহরানে। সেগুলোর মধ্যে তারমিনালে গার্‌ব (আযাদি) পশ্চিম টার্মিনাল নামে খ্যাত। এটি তেহরানের সবচেয়ে বড় টার্মিনাল। এর আয়তন ৫০ হেক্টর। এখানে যাত্রীদের জন্য নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা রয়েছে। তেহরান থেকে পশ্চিম অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য যাত্রীরা এ টার্মিনাল ব্যবহার করে থাকেন। তারমিনালে বায়হাকী তেহরানের অন্যতম বড় টার্মিনাল। এর আয়তন ১৩.৫ হেক্টর যা আর্জেন্টাইন ময়দানের পূর্বে অবস্থিত। শহরের অভ্যন্তরে চলাচলের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া টার্মিনালে শার্‌ক প্রায় তিন হেক্টর জায়গা জুড়ে অবস্থিত। এখানে ৯টি বাস কোম্পানি ও তিনটি মিনিবাস কোম্পানি তাদের যানবাহন পরিচালনা করে থাকে। আর একটি টার্মিনাল হচ্ছে টার্মিনালে জুনুব। দক্ষিণ তেহরান ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের যাত্রীদের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এটি ৩ তলা বিশিষ্ট এবং ১৭ হেক্টর জায়গা জুড়ে এর অবস্থান। ১৯৭৪ সালে এটি স্থাপিত হয়। ২০টি বাস কোম্পইন এ টার্মিনালে যানবাহন পরিচালনা করে থাকে। এসব টার্মিনালে রয়েছে গ্রন্থাগার, মসজিদ, ফার্মেসি ও ক্লিনিক, ছোট পার্ক, বিশ্রামাগার, সাইবার ক্যাফে, টেলিফোন বুথ, পেট্রোল পাম্প, কার ওয়াশ, যাত্রী পরিবহন সংস্থা, সেলুন, পার্কিং, ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার, ড্রাইভারদের বিশ্রামাগার, ব্যায়ামাগার প্রভৃতি। এছাড়া ব্যক্তিগত পরিবহন হিসেবে ভাড়ায় চালিত ট্যাক্সি, কিছু ক্ষেত্রে মোটর সাইকেল ব্যবহৃত হয়। তেহরানের একটি কেন্দ্রীয় রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে যা দেশের বিভিন্ন শহরের সাথে চব্বিশ ঘণ্টা পরিষেবাগুলোকে সংযুক্ত করে, পাশাপাশি একটি তেহরান-ইউরোপ রেল লাইনও চলছে। ১৯৭০-এর দশকে তেহরানের সাবওয়ে সিস্টেম নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ধারণাগত পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল। আটটি প্রস্তাবিত মেট্রো লাইনের মধ্যে প্রথম দুটি ২০০১ সালে খোলা হয়েছিল।

তেহরানে দুটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে। যেখানে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রুটের বিমান চলাচল করে। সমগ্র বিশ্বে এগুলোর পরিচিতি রয়েছে। যার একটি হচ্ছে মেহেরাবাদ, অপরটি ইমাম খোমেইনি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। মেহরাবাদ তেহরানের প্রাচীন বিমান বন্দর। অভ্যন্তরীণ যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে এটি বেশি ব্যবহৃত হয়। আর ইমাম খোমেইনি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ত্রিশ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। আন্তর্জাতিক ভ্রমণের জন্য এটি বেশি ব্যবহৃত হয়। এতে তিনটি টার্মিনাল রয়েছে যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী আসা যাওয়া করেন।

তেহরানের ভ্রমণপিপাসুরা ফিরে আসার সময় যে সকল উপহার সঙ্গে করে নিয়ে আসেন তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার তাজা ও শুকনো ফল, খাবার, হস্তশিল্প, যেমন : কার্পেট, গহনা, চামড়াজাত দ্রব্য, হাতে তৈরি পোশাক, ব্যাগ প্রভৃতি। এসব দ্রব্যাদি প্রাপ্তির জন্য বিখ্যাত স্থান হলো বাজারে সুন্নতি। এর বাইরেও নানা স্থানে এগুলো পাওয়া যায়। যথা : খিয়াবানে ওয়ালি আসর, বাজারে তাজরিসি, বাজারে তেহরান, বাজারে ওদলাজান, খিয়াবানে ইমাম খোমেইনি প্রভৃতি। তেহরানে বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক, শৈল্পিক

গ্র্যান্ড বাজার

ও বৈজ্ঞানিক জাদুঘর রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে জাতীয় জাদুঘর, মালেক জাদুঘর, ফেরদৌস গার্ডেন, সিনেমা জাদুঘর, আবগিনেহ জাদুঘর, কাস্‌র কারাগারের জাদুঘর, কার্পেট জাদুঘর, রিভার্স গ্লাস পেইন্টিং মিউজিয়াম (ভিট্রে আর্ট), সাফির অফিস মেশিন মিউজিয়াম। এছাড়াও সমসাময়িক শিল্পের জাদুঘর, যেখানে ভ্যান গগ, পাবলো পিকাসো এবং অ্যান্ডি ওয়ারহোলের মতো বিখ্যাত শিল্পীদের কাজ রয়েছে। ইরানের ইম্পেরিয়াল ক্রাউন জুয়েলার্স বিশ্বের বৃহত্তম রত্ন সংগ্রহগুলোর মধ্যে একটি, এছাড়াও তেহরানের

জাতীয় গহনা জাদুঘরে প্রদর্শন করা হয়। তেহরানে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, যেগুলো মূলত দেশটির আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত হয়। তেহরানের বার্ষিক আন্তর্জাতিক বইমেলা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা জগতের কাছে এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা ইভেন্ট হিসেবে পরিচিত।

তেহরান ইন্টারন্যাশনাল টাওয়ার

তেহরান ইরানের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্রের শহর। বৃহত্তর তেহরানে প্রায় ৫০টি প্রধান কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আমির কবিরের আদেশে 'দারুল ফুনুন' প্রতিষ্ঠার পর থেকে তেহরান বিপুল সংখ্যক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ইরানি রাজনৈতিক ঘটনা উন্মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্যামুয়েল এম জর্ডান, যাঁর নামে তেহরানের জর্ডান এভিনিউ নামকরণ করা হয়েছিল, তিনি তেহরানের আমেরিকান কলেজের প্রতিষ্ঠাতা পথিকৃৎদের মধ্যে একজন ছিলেন, যা মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম আধুনিক উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটি ছিল।

তেহরানে অবস্থিত প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আমির কাবির ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি (তেহরান পলিটেকনিক), তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়, শরিফ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি এবং তেহরান ইউনিভার্সিটি অফ মেডিকেল সায়েন্সেস সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ। তেহরানে অবস্থিত অন্য প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে তেহরান ইউনিভার্সিটি অফ আর্ট, আল্লামা তাবাতাবাঈ বিশ্ববিদ্যালয়, কে.এন. তুসি ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, শহিদ বেহেস্তি বিশ্ববিদ্যালয় (মেল্লি বিশ্ববিদ্যালয়), খারাজমি বিশ্ববিদ্যালয়, ইরান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইরান ইউনিভার্সিটি অফ মেডিকেল সায়েন্সেস, ইসলামিক আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ভূমিকম্প প্রকৌশল ও সিসমোলজি বিষয়ক ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট, ইরানের পলিমার ও পেট্রোকেমিক্যাল ইনস্টিটিউট, শাহেদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং তারবিয়াত মোদাররেস বিশ্ববিদ্যালয়। তেহরানে ইরানের বৃহত্তম সামরিক অ্যাকাডেমি এবং বেশ কয়েকটি ধর্মীয় স্কুল ও সেমিনারিও রয়েছে।

তেহরানের প্রাচীনতম স্থাপত্য নিদর্শনগুলো কাজার ও পাহলভি যুগের। বৃহত্তর তেহরানে সেলজুক যুগের স্মৃতিস্তম্ভগুলোও রয়ে গেছে; বিশেষ করে রেই-তে টকরোল টাওয়ার। প্রাচীন পার্থিয়ান সাম্রাজ্যের সময়কার রাশকান দুর্গ, যার মধ্যে কিছু নিদর্শন জাতীয় জাদুঘরে রাখা হয়েছে এবং সাসানি সাম্রাজ্য থেকে রয়ে যাওয়া বাহরাম অগ্নি মন্দির প্রসিদ্ধ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তেহরানের জনসংখ্যা খুব কম ছিল, তবে রাজধানী শহর হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পরে ইরানি সমাজে আরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে শুরু করে। কাজার যুগে এবং তার পরে ভূমিকম্পের নিয়মিত ঘটনা সত্ত্বেও সেই যুগের কিছু ঐতিহাসিক ভবন রয়ে গেছে।

তেহরান হলো ইরানের সর্বপ্রধান নগরী এবং এটিকে দেশের সবচেয়ে আধুনিক অবকাঠামো বলে মনে করা হয়। ১৮৩০ সালের পর থেকে তেহরানে বড় ধরনের কোনো ভূমিকম্প হয়নি। তেহরান ইন্টারন্যাশনাল টাওয়ার হচ্ছে ইরানের সবচেয়ে উঁচু আকাশচুম্বী ভবন। এটি ৫৪ তলা লম্বা এবং উত্তরের ইউসেফ আবাদ জেলায় অবস্থিত।

পাহলভি রাজবংশের শাসনামলে নির্মিত একটি স্মৃতিসৌধ আজাদি মিনার দীর্ঘদিন ধরে তেহরানের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রতীক। মূলত ইরানের ইম্পেরিয়াল স্টেট প্রতিষ্ঠার ২,৫০০তম বছরের স্মরণে নির্মিত, এটি হাখামানেশি ও সাসানি যুগের স্থাপত্যের উপাদানগুলোকে পোস্ট-ক্লাসিক্যাল ইরানি স্থাপত্যের সাথে একত্রিত করে। মিলাদ টাওয়ার, যা বিশ্বের ষষ্ঠ উচ্চতম টাওয়ার এবং ২৪তম উচ্চতম ফ্রি স্ট্যান্ডিং কাঠামো, তেহরানের বৃহত্তম পথচারী ওভারপাস, ২০১৪ সালে সম্পন্ন হয়েছিল এবং এটি একটি ল্যান্ডমার্ক হিসেবেও বিবেচিত হয়।

তেহরান পাহাড়, সমতল, মরু এ তিন বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত। এখানে একদিকে যেমন রয়েছে খেলাধুলা, শিক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতির

বোর্জে মিলাদ

নানা সুবিধা অন্যদিকে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঐতিহ্য ও ইতিহাসের স্মারক দর্শনীয় স্থাপত্যসমূহ। সবকিছু মিলে তেহরান এক চোখজুড়ানো শহর। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ভ্রমণপিপাসুরা এখানে এসে প্রকৃতি আর স্থাপত্য অবলোকন করে একরাশ প্রশান্তি নিয়ে ফিরে যান গন্তব্যে।

সূত্র: ইন্টারনেট

লেখক: খণ্ডকালীন শিক্ষক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকায় ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ইরানের ইসলামি বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ৩ জুন ২০২৫ রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে 'ইমাম খোমেইনী (রহ.): ইসলামি দেশগুলো ও মুসলমানদের স্বাধীনতা ও মুক্তির রক্ষক' শীর্ষক এই আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এ বি এম ওবাইদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশি।

বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. এ বি এম ওবাইদুল ইসলাম, মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম থেকে) হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়েদ ইব্রাহীম খলিল রাজাভী, সাইয়েদ রেজা মীর মোহাম্মদী, জনাব মানসুর চাভোশি ও ড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাখালী দারুল উলুম হোসাইনিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল মারুফ ও খুলনার ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্রের প্রিন্সিপাল হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলেমিন সাইয়েদ ইব্রাহীম খলিল রাজাভী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়েদ রেজা মীরমোহাম্মদী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এ বি এম ওবাইদুল ইসলাম বলেন, আজ এমন এক মহান ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করতে এখানে উপস্থিত হয়েছি যিনি বিশ্বের সমসাময়িক ইতিহাসে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন এবং ইরানে ইসলামি বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করে ইতিহাস সৃষ্টিকারীতে পরিণত হয়েছেন। এই মহান ব্যক্তিত্ব ও অনন্য রাজনৈতিক নেতা হলেন ইমাম খোমেইনী (রহ.)। শুধু ইরান নয়, বিশ্বের নানা প্রান্তের মুসলমান আর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মানুষ আজ গভীর শ্রদ্ধায় তাঁকে স্মরণ করছে। তিনি শুধু একটা সময় নয়, গোটা যুগের চিন্তাধারা পাল্টে দেন। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক নেতা, সাহসী বিপ্লবী ও মানবতার জন্য নিবেদিত পথপ্রদর্শক। তাঁর চিন্তা, তাঁর কাজ, আর তাঁর জীবন আমাদের শেখায় বিশ্বাস আর সাহস থাকলে একা একজন মানুষও গোটা সমাজের চেহারা পাল্টে দিতে পারে।

ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর উত্থান ছিল অন্য সবার থেকে আলাদা। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন না; বরং তিনি আল্লাহর উপর ভরসা আর মানুষের ভালবাসার জন্য আত্মত্যাগ এর ধারণা নিয়ে এগিয়ে ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যদি জনগণ সৎ উদ্দেশ্যে এক হয়, আর আল্লাহর সাহায্যে ভরসা রাখে তাহলে বড় বড় শক্তিকেও হারানো যায়। আর সেটাই তিনি করে দেখিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে ইরান থেকে আড়াই হাজার বছরের রাজতন্ত্র চলে যায়, আসে ইসলামি প্রজাতন্ত্র। সে সময় বিশ্ববাসী দেখেছে, ধর্ম, ন্যায়ের লড়াই আর নেতৃত্ব একসাথে কিভাবে ইতিহাস গড়ে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামি বিপ্লব দুনিয়ার মুসলমানের কাছে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সমগ্র মানবতার কাছে এক নুতন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ঐতিহাসিক এই বিপ্লবের সাড়ে ৪ দশকের সাফল্য আজ বিশ্বের সকল মুসলিম ও স্বাধীনতাকামী জাতির জন্য একটি রোল মডেল। নানা ষড়যন্ত্র ও কঠিন অবরোধের মধ্যেও বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে দ্রুত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে দেশটি। শিক্ষা, বিজ্ঞান, উদ্ভাবন, প্রযুক্তিগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখন নেতৃস্থানীয় দেশের তালিকায় রয়েছে ইরান।

ইসলামি বিশ্বে ইরান আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। দেশটি কোনো অপশক্তির কাছে মাথানত করে না। তবে বিশ্বের মজলুম মানুষের পক্ষে দেশটির সহযোগিতার হাত সব সময় প্রসারিত। বিশেষ করে ফিলিস্তিনের মজলুম মানুষের পক্ষে ইরান যেভাবে

সর্বশক্তি দিয়ে সহযোগিতা করে যাচ্ছে এমন নজির বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সব সময় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখায় বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো ইরানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রেখেছে। কিন্তু ইসলামের শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে দেশটি যেভাবে উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে চলেছে তা বিশ্বের জাতিগুলোর জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

সভায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশি বলেন, ইমাম খোমেইনী (রহ.) এমন একজন নেতা ছিলেন যিনি শুধু ইরানে নয় পুরো মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সংস্কৃতি অঙ্গনে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি নিজেকে কেবল ব্যক্তিগত ধর্মচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি ইসলামকে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইসলামের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো যদি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় তাহলে একটি জাতিকে নিপীড়ন ও আধিপত্যকামীদের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব। রাষ্ট্রদূত বলেন, ইমাম খোমেইনী ইসলামকে জীবনের মূল ভিত্তি হিসেবে, সমাজদর্শনের হাতিয়ার হিসেবে চর্চা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র, সকল পর্যায়ে ইসলামকে কিভাবে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যায়।

ইমাম খোমেইনী (রহ.) তাঁর সারাজীবন ইসলামের মূল শিক্ষাগুলোকে নিজের জীবন ও কর্ম দিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। মুসলমানদের তিনি এমন জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন যেখানে তারা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গঠন করতে পারে। ইরানের ইসলামি বিপ্লব তাঁর এই চিন্তাধারার বাস্তব প্রতিফলন। তিনি বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছেন যে, বিশ্বাস ও একতা থাকলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শক্তির বিরুদ্ধেও অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো যায়।

রাষ্ট্রদূত বলেন, ইমাম খোমেইনী (রহ)-এর মৃত্যুর সাড়ে তিন দশক পেরিয়ে গেলেও তাঁর বাণী, তাঁর জীবন আমাদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে আছে।

তিনি বলেন, আজকের বিশ্বের যে সামাজিক অস্থিরতা, যুদ্ধাবস্থা ও পরস্পরের প্রতি যে অবিশ্বাস বিরাজ করছে তা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদেরকে ইমাম খোমেইনীর চিন্তাবোধ থেকে নিজেদেরকে শক্তিশালী করতে হবে এবং তাঁর দেখানো পথ ও আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে। বর্তমানে ইরানসহ বিশ্বের অনেক দেশে তরুণরা স্বাধীন, তাদের চিন্তাভাবনা, চরিত্র, দায়িত্বের দিক থেকে অতীতের চেয়ে এগিয়ে আছে। শুধু প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনায় তাদের পরিচালিত করা। ইমাম খোমেইনীর চিন্তাধারা ও নীতিগুলো ভালোভাবে উপলব্ধি করা তরুণদের জন্য পথ প্রদর্শনীয় হতে পারে। আজকের এই দিনে তাঁর স্মৃতিকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

অনুষ্ঠানে ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী বলেন, বিপ্লবের মহান নেতা এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রূপকার ইমাম খোমেইনী (রহ.) ছিলেন বর্তমান যুগে বিশুদ্ধ ইসলামের পুনরুজ্জীবিতকারী। তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত ইরানের ইসলামি বিপ্লবকে একটি মহান ঐতিহাসিক ঘটনা বলা হয় যা বিশ্বব্যাপী সমীকরণ পাল্টে দেয় এবং পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের বাইরে তৃতীয় একটি ডিসকোর্স তৈরি করে।

সাইয়্যেদ মীরমোহাম্মদী বলেন, বিদেশীদের উপর ইরানে তৎকালীন সরকারের নির্ভরশীলতা ও দেশটিতে প্রকৃত স্বাধীনতা না থাকার কারণেই মূলত ইমাম খোমেইনী (রহ.) ইসলামি বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ইরানসহ সকল মসলিম দেশ ও জাতির প্রকৃত স্বাধীনতা থাকা উচিত এবং বিদেশী শক্তির উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত থাকা উচিত। তিনি মনে করতেন প্রকৃত স্বাধীনতা না থাকা ও বিদেশী শক্তির উপর নির্ভরশীলতা ইরানসহ অন্য মুসলিম দেশগুলোর উন্নয়ন ও অগ্রতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। এই শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে ইসলামি দেশগুলোর স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, স্বাধীনতা এবং মুক্ত জাতিগুলোর মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে একটি এবং তাদের নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে অবশ্যই তা অর্জন করতে হবে।

কালচারাল কাউন্সেলর আশা প্রকাশ করেন যে, ইরানের মতো সকল ইসলামি দেশ এবং মুসলিম জাতি পূর্ণ স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জন করবে এবং তাদের ঐক্য ও সংহতির মাধ্যমে গাজা ও ফিলিস্তিন সমস্যাসহ ইসলামি বিশ্বের সকল সমস্যা সমাধান করবে।

অনুষ্ঠানে খুলনার ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্রের প্রিন্সিপাল হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন সাইয়্যেদ ইব্রাহীম খলিল রাজাভী বলেন, বলা হতো ইসলাম ধর্ম শুধু মসজিদেই বন্দি হয়ে থাকবে। ইসলামকে রাষ্ট্র গঠনে বা রাজনৈতিক ভূমিকায় রাখার কোনো

অবকাশ নেই। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা থেকে দূরে রাখতেই এমনটি বলা হতো। কিন্তু ইমাম খোমেইনী (রহ.) এই ধারণাতে পরিবর্তন এনেছিলেন। তিনি একটি সফল বিপ্লব ঘটানোর মাধ্যমে সারা বিশ্বের মুসলমানকে আশান্বিত করেছেন। সেই বিপ্লবের পর থেকে ইসলামের শত্রুরা ইরানের বিরুদ্ধে আরো বেশি শত্রুতায় লিপ্ত হয়। তারা এই বিপ্লবকে 'শিয়া বিপ্লব' বলে বিশ্বে প্রচার করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ইসলামের শত্রুদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি। ইমাম খোমেইনীর হাত ছিল সবসময় মজলুমদের জন্য প্রসারিত। তিনি ছিলেন বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের নেতা। বিপ্লবের পরপরই ইমাম খোমেইনী ফিলিস্তিনের মজলুমদের পাশে অবস্থান নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'যেখানেই মজলুম রয়েছে সেখানেই আমাদের অবস্থান।'

জানব ইব্রাহীম খলিল রাজাভী বলেন, বিশ্বে যখন মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ-বিভাজন চরম আকার ধারণ করেছিল এবং মুসলমানদের একত্রিত হওয়াটাই কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখনই ইমাম খোমেইনী ঐক্যের ডাক দিয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্মবার্ষিকীর তারিখ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ ছিল। এ সমস্যা সমাধানে ইমাম খোমেইনী ১২-১৭ রবিয়াল আউয়াল 'ঐক্য সপ্তাহ' পালনের ডাক দিয়েছিলেন। সেই চেতনার প্রতিফলন আজ ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ফ্রন্টে দেখা যায়।

মহাখালী দারুল উলুম হোসেইনিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল মারুফ বলেন, ইমাম খোমেইনী (রহ.) মুসলিম বিশ্বের জন্য কী রেখে গেছেন তা ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানকে কাছে থেকে না দেখলে বুঝা সম্ভব নয়। ইসলামি বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন কুরআনের বাহক আলেমরাও দেশের নেতৃত্ব দিতে পারে। তিনি পশ্চিমাদের ভুল ভেঙে দিয়েছিলেন।

ড. নজরুল ইসলাম বলেন, 'আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও ভরসা ছিল বলেই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ বদর এবং ওহুদের প্রতিকূল যুদ্ধের মধ্যেও বিজয়ী করেছিলেন। ঠিক তেমনি আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং ইমান ছিল বলেই আল্লাহ তা'আলা হযরত ইমাম খোমেইনীকেও বিজয়ী করেছেন। তাঁর এই বিজয় পুরো বিশ্ব দেখেছে। তিনি ইসলামের পতাকাতলে সকলকে একত্রিত করতে চেয়েছেন।

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল মারুফ আরো বলেন, ইরানে ইমাম খোমেইনীর ইসলামি বিপ্লবের চেতনা আজও ইরানের তরুণদের উদ্দীপনায় রয়েছে। ইরানের তরুণরা সেই আর্দশকে ধারণ করে চলে বলে তারা পশ্চিমাদের চ্যালেঞ্জ করতে পারে। আমাদেরও উচিত তাঁর সেই জীবনাদর্শ অনুকরণ করে চলা।

ঢাকায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রায়িসির শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম থেকে) মাওলানা ফাহিমুর রহমান, জনাব সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান ও জনাব কামাল উদ্দিন সবুজ

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ ইব্রাহিম রায়িসি ও তাঁর সফরসঙ্গীদের ১ম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২০ মে ২০২৫ রাজধানীর ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। 'ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট শহিদ ইব্রাহিম রায়িসির গভার্নেন্স মডেল' শীর্ষক এই আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান ও দৈনিক দেশ রূপান্তরের সম্পাদক ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি কামাল উদ্দিন সবুজ। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজধানীর গুলশান কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম মাওলানা ফাহিমুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মাদী।

আলোচনা সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, ইরানের শাহবিরোধী বিপ্লবে শহিদ ইব্রাহিম রায়িসি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লব পরবর্তী ইসলামি প্রজাতন্ত্রে তিনি সরকারি চাকরিতে বিচার প্রশাসনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর মেধা, যোগ্যতা ও মননের মধ্য দিয়ে সেখানের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে আসীন হয়েছিলেন। তিনি ইরানের অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন। প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই পদগুলোতে থাকা অবস্থায় তিনি ইরানের বিচার বিভাগ এবং আইন ব্যবস্থাপনায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধনের মাধ্যমে ইরানের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে তিনি হাসান রুহানির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সেই নির্বাচনে তিনি জয় লাভ করেননি বটে, কিন্তু ইরানের মানুষের ব্যাপকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যার ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালের নির্বাচনে বিপুলভাবে জনসমর্থিত হয়ে ইরানের ৮ম প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন।

ড. ছিদ্দিকুর রহমান বলেন, এমন একটা সময় ইব্রাহিম রায়িসি ইরানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, যখন ইরান নানামুখী সংকটে নিমজ্জিত ছিল। অর্থনৈতিক সংকট ছিল অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। তখন ইরানের জনগণের দুর্ভোগের অন্যতম কারণ ছিল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ইরানের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে একের পর এক অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের মধ্য দিয়ে ইরানকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু

করার অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় তাঁর সুচিন্তিত ও প্রাজ্ঞ্য নীতিতে সফল হয়েছিলেন। তিনি তরুণদেরকে তাঁর দেশের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলার প্রথম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। বেকারত্ব দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। পলিটিক্যাল এলিট ও সামাজিক এলিটদের স্বার্থের চেয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কোনো ব্যক্তিতুষ্টি নয়, জনতুষ্টির লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি ইরানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করেছেন।

এছাড়া তিনি আমলাতন্ত্রের জটিলতা, দুর্নীতি দূরীভূত করে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে এসব উদ্যোগের সুফল নাগরিকরা পেতে শুরু করেছিলেন। অর্থনৈতিক কূটনীতির উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি তাঁর বিদেশ নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। চীনের সাথে ইরানের সম্পর্কের উন্নয়ন, ব্রিকসের সদস্যপদ প্রাপ্তি এগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, রায়িসি ইরানের ইসলামি বিপ্লবকে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করতেন। এই বিপ্লবের চেতনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিনি রাষ্ট্রীয়, বেসামরিক প্রাসন এবং অন্যান্য যে বৈদেশিক নীতি আছে সেগুলোকে ঢেলে সাজানোর একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সেখানেও তিনি ইরানের মূল যে রাষ্ট্রীয় নীতি তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মধ্যপ্রাচ্যের সংকট নিরসনে চেষ্টা চালিয়েছেন। সিরিয়াতে ইরানিয়ান কনস্যুলেটে ইসরাইলি হামলার পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন তিনি। ইসরাইলের অভ্যন্তরে সঠিক নিশানায় হামলা করে সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ও জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট। তাঁকে বলা হতো 'জনতার প্রেসিডেন্ট'।

আলোচনা সভায় ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী বলেন, ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ ইব্রাহিম রায়িসি ছিলেন একজন বড় মাপের আলেম, চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ। জীবনের পথ চলার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে যেসব দিকনির্দেশনা রয়েছে ইব্রাহিম রায়িসির জীবনাচরণ ও কর্মে তা প্রতিফলিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী একজন ব্যক্তি কিভাবে পথ চলবে, একজন শাসক কিভাবে দায়িত্ব পালন করবে সেই নির্দেশনা যেন তিনি হুবহু অনুসরণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর হওয়ার এবং ইসলামের অনুসারীদের ব্যাপারে নমনীয় হওয়ার যে নির্দেশনা রয়েছে তিনি তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতেন। তিনি বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য ছিলেন অত্যন্ত উদার ও নমনীয়। তিনি সবসময় মানুষের জন্য কাজ করেছেন। মানুষের সেবায় তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনায়ক। তিনি যখনি যে দায়িত্ব পালন করেছেন লক্ষ্য ছিল মহান আল্লাহ যেন তাঁর কাজের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষের সেবা করার চেষ্টা করতেন। তিনি দেশের ভেতরে ও বাইরে যে দায়িত্ব পালন করেছেন তা ছিল মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথেই। ইসলামের শত্রুদেরকে তিনি শত্রু হিসেবে এবং ইসলামের বন্ধুদেরকে তিনি বন্ধু হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতেন। জনগণের সেবাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) তাঁর গভর্নর মালেক আশতারের কাছে লেখা চিঠিতে বলেছিলেন, তুমি যে কাজই করবে লক্ষ্য যেন হয় জনসেবা। জনগণের স্বার্থই যেন সেখানে প্রাধান্য পায়। কোনো দল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি বিশেষ করে ক্ষমতাশালী ও বিত্তশালীরা যেন সেখানে প্রাধান্য না পায়। জনগণের জন্য কাজ করাই যেন তোমার প্রধান লক্ষ্য থাকে। ইব্রাহিম রায়িসি হযরত আলীর ঐ চিঠিটির নির্দেশনা যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তিনি তাঁর দিন রাতের কাজকর্মে জনসেবা ও জনগণের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতেন।

ইব্রাহিম রায়িসির ব্যক্তিত্বের একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল সততা ও ন্যায়পরায়ণতা। তিনি অন্তরে যেটা ধারণ করতেন মুখে তাই বলতেন এবং কর্মের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতেন। একজন সরকারপ্রধান যখন এমন সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন এবং জনগণও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়। ড. রায়িসি ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী একজন মানুষ। ক্লান্তি কী তা তাঁর মধ্যে দেখা যেত না। তাঁর কোনো ছুটির দিন ছিল না। তিনি সর্বদা কাজের মধ্যেই নিমজ্জিত থাকতেন। আর এসব গুণই তাঁকে একজন সফল রাষ্ট্রনায়কে পরিণত করেছিল।

আলোচনা সভায় দৈনিক দেশ রূপান্তর এর সম্পাদক ও জাতীয়

প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি কামাল উদ্দিন সবুজ বলেন, ইরান থেকে বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে অনেক দূরে হলেও সম্পর্কের দিক থেকে দেশ দুটি খুবই নিকটে। দেশ দুটির মধ্যে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক রয়েছে। ইরান একটি প্রাচীন সভ্যতার দেশ। ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে দেশটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ইরানের বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক হাফিজ, রুমি, শেখ সাদি, ওমর খৈয়াম এদেশে খুবই জনপ্রিয়। আমি নিজেও ইরানি কবি-সাহিত্যিকদের ভক্ত। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও ইরানি কবি হাফিজের সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

তিনি বলেন, ইরানিরা সাহসী জাতি। তারা কখনই পরাজিত হয়নি। যখন এই দেশটির প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রায়িসির হেলিকপ্টার নিখোঁজ হওয়ার খবর আসে তখন শুধু ইরান নয় বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের সকলেই সেই হেলিকপ্টারের খবর জানার জন্য উদগ্রীব ছিল। আমার বারবার সন্দেহ হচ্ছিল এটা কোনো ষড়যন্ত্র কিনা? কারণ, আমরা সকলেই জানি ইব্রাহিম রায়িসি ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদী আগ্রাসানের বিরুদ্ধে কতটা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছেন। ইরান কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়ার পর আমরা সকলেই গভীরভাবে শোকাহত ছিলাম। আমি জান্নাতে শহিদ ইব্রাহিম রায়িসি ও তাঁর সঙ্গীদের উচ্চ মর্যাদা কামনা করছি।

কামাল উদ্দিন সবুজ বলেন, ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদী ইসরাইলের বর্বর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একমাত্র ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান জোরালো প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে এবং ফিলিস্তিনকে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করে আসছে। আর অন্য মুসলিম দেশগুলো নীরব ভূমিকা পালন করছে। এই দেশগুলো যদি শহিদ ইব্রাহিম রায়িসির নীতি অনুসরণ করে ঐক্যবদ্ধ হতো তাহলে ইহুদিবাদী ইসরাইল মুসলমানদের পুণ্যভূমি ফিলিস্তিনে এমন বর্বরোচিত হামলা করার সাহস পেত না। তিনি ফিলিস্তিন সংকট নিরসনে ওআইসি ও আরব লীগের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

আলোচনা সভায় গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের ইমাম মাওলানা ফাহিমুর রহমান বলেন, ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট শহিদ ইব্রাহিম রাইসি মুসলিম উম্মাহর জন্য যা করে গেছেন, তা দু এক কথার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমার স্পষ্ট মনে আছে, তাঁর শাহাদাতের খবরের পর বাংলাদেশে বিভিন্ন মসজিদে দোয়ার আয়োজন হয়েছে। আমরাও রাজধানীর গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করেছি। এটা শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বের মুসলিম জাতির জন্য শোকাবহ সময় ছিল। ইব্রাহিম রায়িসির জানাযার নামাযে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিই প্রমাণ করে তাঁর প্রতি মানুষ কতটা সন্তুষ্ট ছিল।

মাওলানা ফাহিমুর রহমান বলেন, ইরানের সরকার ও জনগণের ফিলিস্তিনের নিপীড়িত মানুষের জন্য ভালোবাসা ও আবেগ অনেক বেশি। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বলেন, 'ইরানের এক কিরাত প্রতিযোগিতায় আমি উপস্থিত ছিলাম, সেখানে দেখলাম ইরানের প্রত্যেক ক্বারী তাঁদের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ শেষে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা প্রদর্শন করছিলেন।'

ইব্রাহিম রায়িসিও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। মাওলানা ফাহিমুর রহমান তাঁর শিক্ষকের উপদেশের কথা স্মরণ করে বলেন, 'নেতৃত্ব দানের পূর্বে তুমি জ্ঞানী ও যোগ্য হও।' তিনি ইব্রাহিম রায়িসিকে সেই নেতৃত্বের জন্য তেমনই আর্দশ নেতা মনে করেন। তিনি বলেন, কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী যোগ্য নেতার গুণাবলি, যেমন : সৎ পথে থাকা, ন্যায় বিচারে অবিচল থাকা, এসব প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রায়িসির মধ্যে আমরা দেখতে পাই।

ঢাকায় 'নজরুল সাহিত্যে ফারসির প্রভাব' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বক্তব্য রাখছেন ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত জনাব মানসুর চাভোশি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে গত ২৮ মে, ২০২৫ বিকেলে 'নজরুল সাহিত্যে ফারসির প্রভাব' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, আন্‌জুমানে ফারসি বাংলাদেশ ও ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশি। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান ও ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. হোসনে আরা। কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক মো. লতিফুল ইসলাম শিবলীর সভাপতিত্বে সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্‌জুমানে ফারসি বাংলাদেশ-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান ও আন্‌জুমানে ফারসি বাংলাদেশ-এর সাধারণ সম্পাদক ড. মো. মুমিত আল রশিদ।

সেমিনারে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশি বলেন, বাংলা ও ফারসি ভাষার মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা অনেক কাছের এবং গভীর। আমার মনে হয় নজরুল শুধু ফারসি ভাষা বা পরিভাষাকে আয়ত্ত করেননি, ফারসির প্রাণসত্তাকে ভাষান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন। নজরুল ইন্সটিটিউট এর সাথে আরো কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমার মনে হয় আন্‌জুমানে ফারসি বাংলাদেশ ও নজরুল ইন্সটিটিউট বাংলা ও ফারসি ভাষার পারস্পরিক অনুবাদের উদ্যোগ নিতে পারে। এই দুটি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করতে পারে। হাফিজের গজল এবং কবিতার মধ্যে যে সংগীত ও ছন্দ তথ্য আছে সেগুলো নিয়েও কাজ করতে পারে নজরুল ইনস্টিটিউট। নজরুলের সাহিত্য সাধনাকে ইরান ও বাংলাদেশের ভাষা ও সাহিত্যের সেতুবন্ধন হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, বিশ্বের সকল মহান কবি দার্শনিকদের মনের ভাষা এক এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই নজরুল ফারসি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং অনেক ফারসি শব্দ ব্যবহার করে সাহিত্য রচনা করেছেন। ফারসি সাহিত্যে যেমন স্বাধীনতা, মানবতা, প্রেমের কথা রয়েছে,

নজরুলের সাহিত্য কর্মেও তা লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান শুধু নজরুলের অতীত সাহিত্য রোমন্থন করার জন্য নয়; বরং তাঁকে নিয়ে ভবিষ্যতে কাজ করার জন্যও বটে।

সেমিনারের বিশেষ অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম যখন কবি হিসেবে আবির্ভূত হন তখন বাংলা সাহিত্যের জগতকে আলোকচ্ছটায় প্রভাবিত করে রেখেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর প্রভাবের মধ্যেই নজরুল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এক স্বতন্ত্র মহিমায়। স্বল্প সময়ের মধ্যেই সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনে তাঁর সরব ও সক্রিয় উপস্থিতি ছিল। নজরুলের কাব্যে ফারসি ভাষার দখলের কিছুটা তিনি পারিবারিক পরিমণ্ডলেই আত্মস্থ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে সৈনিক হিসেবে করাচিতে গিয়ে ফারসি শিখেছিলেন। নজরুলের কাব্যে পারস্যের কবি হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে ইরানের সরকার যেমনভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে তেমনভাবে অন্য বিদেশী ভাষাকে আমাদের দেশে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয় না। উদাহরণ হিসেবে তিনি আরবি ও উর্দু বিভাগের কথা বলেন।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে সাহিত্যচর্চা বিশেষ করে নজরুল সাহিত্যচর্চার উপযোগিতা কতটুকু তা তুলে ধরে ড. ছিদ্দিকুর রহমান বলেন, আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। দেশের স্বার্থে যে কোনো আন্দোলনে প্রেরণা হিসেবে, শক্তি হিসেবে নজরুলের বাণী বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

আমরা গভীর একটি সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। বৈশ্বিক সংকটের মধ্যে আছে গাজা, মধ্যপ্রাচ্য, এমনকি ইরানের উপরও সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমাদের আগ্রাসন চলছে; বাংলাদেশেও আমরা খুব একটা স্বস্তির মধ্যে নেই। এই অবস্থার মধ্যে নজরুলের সাম্য ও মানবতার বাণী নতুন করে আমাদের পথের দিশা দিতে পারে।

সেমিনারে ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী বলেন, ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতা জোরদারের ক্ষেত্রে বিস্তৃত এবং গভীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি এবং প্রেক্ষাপট রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো ফারসি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পারস্পরিক প্রভাব।

তিনি বলেন, ৭০০ বছর আগে, বাংলার শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ যখন ইরানের কবি হাফেজ শিরাজিকে বাংলায় ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানান তখন তিনি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাংলায় ভ্রমণ করতে না পারায় কবি হাফিজ সুলতান গিয়াসউদ্দিনের কাছে একটি গজল লিখে পাঠন। ঐ গজলে লেখা হয়,

আজকে পাঠাই বাংলায় পারস্যের এই এই ইক্ষু শাখা
তাতেই হবে ভারতের সকল তোতার চঞ্চু মিষ্টি মাখা।

এই কবিতা দুই দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা, তার গুরুত্ব এবং গভীরতা প্রদর্শন করে।

সাইয়্যেদ মীরমোহাম্মদী বলেন, যখন বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ফারসি কবিতা ও সাহিত্যের জাদুর সাথে পরিচিত হন এবং হাফেজ, খৈয়াম, রুমি এবং সাদির মতো মহান ফারসি কবিদের দ্বারা মুগ্ধ হন, তখন এই সাহিত্যিক বন্ধনের ধারাবাহিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এটা ফুটে ওঠে যে, সাহিত্যই সেই সেতু যা শতাব্দীকাল ধরে দুই দেশকে সংযুক্ত করে রেখেছে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি, কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক মোঃ লতিফুল ইসলাম শিবলী বলেন, নজরুলের জীবনীতে করাচি পর্বটা পড়লে দেখা যায় তাঁর সাহিত্যের যে উন্মেষ, সাহিত্য চেতনার জাগরণের স্থান করাচিতেই। তিনি সেখানে ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের সাথে পরিচিত হন, তাঁদের লেখা দ্বারা প্রভাবিত হন এবং সেখানেই তিনি ফারসি ভালোভাবে আত্মস্থ করেন।

তিনি বলেন, আমাদের আদি রাষ্ট্রভাষা ছিল ফারসি। আবার আমরা যারা ইসলামের সাহিত্য, কুরআন, হাদিস, তাফসির পড়েছি এসব কিছুর অনুবাদে প্রভাব ছিল ফারসি ভাষার। ব্রিটিশরা

উপমহাদেশে ক্ষমতাসীন হয়েই কিন্তু ফারসি ভাষা বন্ধ করতে পারেনি। আইন, আদালত ও রাষ্ট্রীয় কর্মের ভাষা হিসেবে ফারসি তখন এতটাই অপরিহার্য ছিল যে, তারা হঠাৎ করে বন্ধ করতে পারেনি। অবশেষে ১৮৩৭ সালে আইন করে ফারসি ভাষা নিষিদ্ধ করে। তারা শুধু আমাদের উপর অর্থনৈতিক আগ্রাসনই চালায়নি, অনেক বড় আকারে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনও চালিয়েছিল। সেই আগ্রাসনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরবি ও ফারসি।

ফারসিকে আমাদের ঐতিহ্যের ভাষা হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, এই ভাষাকে নিজেদের সাথে আরো বেশি যুক্ত করতে হবে। আমরা যেমন পারস্য ও সেখানকার শিল্প-সাহিত্যকে নজরুলের চোখ দিয়ে দেখি, ঠিক তেমনি আমরা পারস্যবাসীকে আমাদের নজরুলকে চেনাতে চাই।

সেমিনারের প্রবন্ধ উপস্থাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হোসনে আরা বলেন, ইরান ও ভারতীয় উপমহাদেশ বিশেষ করে বাংলার মধ্যে সম্পর্ক অনেক গভীর ও প্রাচীন। তিনি বলেন, মূলত ইরানি ও ভারতীয় একই আর্যগোষ্ঠীর দুই শাখা। তাই চিরদিনই ভারত ও পারস্যের আত্মা সমসূত্রে গ্রথিত।

পারস্যের কবি হাফিজ লিখেছেন,
আজকে পাঠাই বাংলায় এই ইক্ষু শাখা ।
তাতেই হবে ভারতের সকল তোতার চঞ্চু মিষ্টি মাখা।

অর্থাৎ ফারসি ভাষার মিষ্টি বাংলায় পাঠালে সেই মিষ্টিতে সমগ্র ভারতের মানুষের ভাষা আরও মিষ্টি হয়ে যাবে। এর মধ্য দিয়ে কবি বাংলাকে যে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বাংলাকে তিনি কতটুকু ভালবাসেন তার প্রমাণ মেলে। অপরদিকে বাংলার অনেক কবি সাহিত্যিক ফারসি কবিতা ও সাহিত্যের দ্বারা দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। বিশেষ করে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মে ফারসির প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যায়। তিনি কেবল তাঁর সাহিত্যকর্মে ফারসি শব্দই ব্যবহার করেননি। তিনি অনেক ফারসি রুবাইয়াৎ সরাসরি অনুবাদ করেছেন। বিদেশি শব্দের মিশ্রণে বিশেষ করে ফারসি শব্দের মিশ্রণে কবি নজরুলের সাহিত্যকর্ম বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। নজরুল ফারসি সাহিত্য দ্বারা এতোই প্রভাবিত ছিলেন যে, কেউ কেউ বলতেন, ইরান কবির দ্বিতীয় মাতৃভূমি।

অধ্যাপক হোসনে আরা বলেন, সুলতান গিয়াস উদ্দিনের আমন্ত্রণে কবি হাফিজ বাংলায় আসতে না পারলেও নজরুলের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারেননি। রুবাইয়াতে হাফিজ অনুবাদ করে কবি নজরুল সবসময়ের জন্য বাংলায় এনেছেন কবি হাফিজকে।

পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্র হিসেবে ইরানের অবস্থান সুদৃঢ়

২০০০তম লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার মাধ্যমে তেহরানের ইমাম খোমেইনী (রহ.) হাসপাতাল পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্র হিসেবে ইরানের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করেছে। লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিভাগের প্রধান আলী জাফারিয়ান বলেন, 'ইরান পশ্চিম এশিয়ায় লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টের অগ্রগামী দেশ এবং এখানে সম্পন্ন হওয়া প্রতিস্থাপন কার্যক্রমের ফলাফল আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে তুলনীয়।' তিনি আরও বলেন, 'তেহরানের ইমাম খোমেইনী (রহ.) হাসপাতালে প্রতি মাসে ১৫ থেকে ২০টি লিভার প্রতিস্থাপন করা হয় এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় কম খরচে উচ্চমানের সেবা দেওয়া হয়।'

ইরানি গবেষকের কোভিড-১৯ এবং ক্যান্সার রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার

বাসায় বসে কোভিড-১৯ এবং ক্যান্সার নির্ণয় করা যাবে নির্ভুলভাবে। এর ফলে কোভিড-১৯ ও ক্যান্সার নির্ণয় অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে। কামিয়ার বেহরোজি নামে একজন ইরানি গবেষক কম খরচের বায়োসেন্সর প্রযুক্তি দিয়ে একটি নতুন উপকরণ আবিষ্কার করেছেন, যা এ সংক্রান্ত হোম টেস্টকে কোভিডের মতো ভাইরাসের প্রতি ১০০ গুণ বেশি সংবেদনশীল করে তোলে। এই ডায়াগনস্টিক পদ্ধতিটি প্রোস্টেট ক্যান্সার এবং সেপটিসেমিয়ার মতো অন্যান্য বিপজ্জনক রোগ নির্ণয়েও কার্যকর। ইরানি গবেষক কামিয়ার বেহরোজি তাঁর এই আবিষ্কার প্রসঙ্গে বলেছেন, এই সহজ ও কার্যকর পদ্ধতিটি বর্তমানে বিদ্যমান ডায়াগনস্টিক পদ্ধতিগুলোর তুলনায় অগ্রগামী, কারণ এটি অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত সঠিক ফলাফল প্রদান করতে পারে।

নিউজ লেটার
৪৬ তম বর্ষ: ১ম-২য় সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০২৫ ইং | শাওয়াল-জিলহজ ১৪৪৬ হিজরি

ইরানের ইসলামি বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ৩ জুন ২০২৫ রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে গত ২৮ মে, ২০২৫ 'নজরুল সাহিত্যে ফারসির প্রভাব' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম থেকে) ড. মো. মুমিত আল রশিদ, জনাব সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, জনাব মানসুর চাভোশি, জনাব মো. লতিফুল ইসলাম শিবলী, প্রফেসর ড. মো. কামাল উদ্দিন ও অধ্যাপক হোসনে আরা।